বিশ্ব-ইতিহাস পরিচয়
(আধুনিক যুগ)
শ্রীনির্মলেন্দু দাসগুপ্ত

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal as a text-book for Class VIII, Vide Notification No. Syl./68/55 dated 18. 10. 55 and Calcutta Gazette dated 24. 11. 55.

# বিশ্ব-ইতিহাস পরিচয়

( আধুনিক যুগ )

[ অষ্টম শ্রেণীর জন্য ]


শ্রীনির্মলেন্দু দাসগুপ্ত এম. এ.

মেদিনাপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক


সংশোধিত সংস্করণ


বাণীবিহার

৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীতড়িৎকুমার বসু
বাণীবিহার
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬



মূল্য—১৸৴০

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগৌরীশঙ্কর রায় চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

# সূচীপত্র

( ১ )

# রেনেসাঁস্ ও রিফর্মেশন

## (ক) রেনেসাঁস্

**নবযুগের সূচনা।** চতুর্দশ শতাব্দী হইতে সুরু করিয়া পরবর্তী কয়েকশত বৎসর ইউরোপ এক নূতন জীবনের স্পন্দনে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় কয়েকটি সুদূর প্রসারী আন্দোলনের মধ্য দিয়া ইউরোপের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ধীরে ধীরে এক গুরুতর পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহার ফলে ইউরোপের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও সংস্কৃতি বহু পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছিল এবং সকলের অলক্ষ্যে ইউরোপ মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া এক নবযুগে পদার্পণ করিল। রেনেসাঁস্ বা বিদ্যার পুনর্জন্ম, রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারযাত্রা ছিল এ যুগের বিস্ময়কর আন্দোলনগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

**ইউরোপে তামস যুগ।** মধ্যযুগের সূচনায় যখন বর্বর জাতির আক্রমণে এবং অন্তর্বিপ্লবে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতিও ইউরোপ হইতে একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গেল। মানুষের মনোজগতে জ্ঞানের যে প্রদীপটি এতকাল আলোক বিকিরণ করিতেছিল তাহা নিভিয়া গেল। মধ্যযুগের প্রথম ভাগকে এজন্য তামস যুগ বলা হয়।

রোমান সাম্রাজ্য পতনের ফলে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। তারপর যখন বর্বর জাতি ইউরোপের বিভিন্ন অংশে শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিল, তখন ধীরে ধীরে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল এবং জ্ঞানানুশীলনের দিকে আবার

মানুষের দৃষ্টি পড়িল। এ যুগে রোমান ক্যাথলিক চার্চ বা ধর্মমণ্ডল এবং মঠগুলি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির একমাত্র উৎস। ল্যাটিন ভাষা ছিল শিক্ষার বাহন। সাধারণতঃ যাজক শ্রেণী ও মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যেই শিক্ষা আবদ্ধ ছিল। লেখাপড়ার চর্চা চার্চ ও মঠের বাহিরে ছিলই না। পোপ যাহা বলিতেন, যাজকরা যাহা শিখাইত, তাহাই সকল মানুষকে অভ্রান্ত ও ভগবানের বিধি বলিয়া মানিয়া লইতে হইত। চার্চের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন চিন্তা বা বিচার দ্বারা কোন বিদ্যা অনুশীলন করা চলিত না। কেহ করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইত। মধ্যযুগে চার্চের শিক্ষানীতি মানুষের জ্ঞানোন্নতির পথ ও তাহার প্রাণের গতি রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রেনেসাঁস্ এই রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া জ্ঞানের ধারা মুক্ত করিয়া দিল।

**গ্রীক ও রোমান বিদ্যার আলোচনা।** রেনেসাঁস্ কথাটির অর্থ বিদ্যার পুনর্জন্ম—নব জাগরণ। মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে নূতন করিয়া গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন মানুষকে স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা দিয়াছে। যে কোন প্রশ্ন সংস্কার-মুক্ত মন লইয়া বিচার করিতে হইবে, বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে যাচাই করিয়া সত্য বলিয়া মনে হইলে তবেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ছিল গ্রীক শিক্ষার মূল কথা। গ্রীক জীবনাদর্শও মধ্যযুগীয় আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। গ্রীকরা ছিল প্রাণের আনন্দে ভরপূর। ঐহিক ভোগসুখকে তাহারা প্রত্যাখ্যান করে নাই বরং স্বাভাবিক মানুষের মত সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর সৌন্দর্য তাহাদের প্রাণে আনন্দ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগে খৃষ্টান যাজকরা মানুষকে ভোগসুখে বিরত থাকিয়া সাধন ভজন দ্বারা আপনার মুক্তি কামনার উপদেশ দিয়াছেন। ঐহিক ভোগসুখ মানুষকে নরকের পথে লইয়া যায়, ইহাই

বুঝাইয়াছেন। গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার ফলে ইউরোপের বিদ্বৎ সমাজ যেন নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস, নীতিবোধ ও জীবনাদর্শে বিরাট পরিবর্তন আসিল। ইহার ফলে ইউরোপের মনীষা নব নব ধারায় বিকাশের পথ খুঁজিতে লাগিল।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কিরা কনষ্টান্টিনোপল জয় করিয়া লইল। এই নগরটি ছিল সে যুগে গ্রীক সাহিত্য দর্শন অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র। ইহা তুর্কিদের দখলে যাইবামাত্র গ্রীক আচার্যগণ দলে দলে কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করিয়া ইটালী ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মূল গ্রীক গ্রন্থগুলি সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই সময় হইতে মূল গ্রীক গ্রন্থের সহিত ইউরোপীয় মনীষীদের পরিচয় হইতে লাগিল এবং গ্রীক সাহিত্য চর্চার দিকে লোকের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। গ্রীক সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন সাহিত্যের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়িল। ইউরোপের প্রাচীন সংস্কৃতি নূতনভাবে মানবচিত্তে জন্মগ্রহণ করিল। অনেকের মতে কনষ্টান্টিনোপলের পতনের সময় হইতেই রেনেসাঁসের আরম্ভ হয়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। ইতিহাসের যুগ পরিবর্তন কোনও একটি বিশেষ দিনে বিশেষ একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া আসে না। বহুকাল ধরিয়া, বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই ঘটে যুগপরিবর্তন।

**মধ্যযুগে শিক্ষার ধারা।** মধ্যযুগে ইউরোপের প্রগতি একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। শার্লেমেন তাঁহার সাম্রাজ্যে কয়েকটি বিত্যায়তন স্থাপিত করেন। এখানে গ্রীক তর্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিত্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। তারপর একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বোলোনা, প্যারিস্, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিত্যালয় স্থাপিত হইল এবং এখানে

গ্রীক দর্শন প্রভৃতির আলোচনা হইত। ইহার ফলে শিক্ষার্থীদের মনে অনুসন্ধিৎসা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই সময় মূল গ্রীকগ্রন্থ পাওয়া যাইত না, গ্রীক ভাষাও কেহ বুঝিত না। গ্রীক দর্শন প্রভৃতির আলোচনা তখন হইত মূল গ্রীক হইতে অনুদিত আরবী গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদের সাহায্যে। সুতরাং গ্রীক বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ। তাহা হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে জ্ঞানানুশীলন চলিত তাহার ফলেই ধীরে ধীরে রেনেসাঁস আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলন ইউরোপে ব্যাপকভাবে সুরু হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় আর প্রাচীন সংস্কৃতির আলোচনা লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সৃজনী প্রতিভা নব নব সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ললিতকলা ও শিল্প সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হইল। রেনেসাঁস আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে।

**রেনেসাঁসের জন্মভূমি।** রেনেসাঁস আন্দোলন জন্মগ্রহণ করে ইটালীদেশে। ইহার কারণও ছিল। ভূমধ্যসাগর অঞ্চল ছিল মধ্য-যুগের শেষার্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। ক্রুসেডের যুগ হইতে ভেনিস্, মিলান, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি ইটালীদেশের নগরগুলি ব্যবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল এবং এই সকল স্থানে এক উন্নত ধরণের নাগরিক জীবন বিকাশ লাভ করিল। সুসভ্য বণিক নাগরিকদের অর্থ ছিল, অবসরও ছিল প্রচুর। বাণিজ্য করিতে যাইয়া ইহারা যখন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাইল তখন ইহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া অপরিসীম আগ্রহ ও উদ্যমের সহিত তাহা অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিল। ইহারই ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর নগরগুলিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ললিত কলার অপূর্ব বিকাশ দেখা দিল। ইটালী হইতে ইহা পশ্চিম ইউরোপে ছড়াইয়া গেল।

**মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার ও জ্ঞানের বিস্তার**। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁস আন্দোলনের চরম বিকাশ ঘটে। ইহার পশ্চাতে একটি বড় কারণ ছিল মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার। এই শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানার প্রচলন হয়। রেনেসাঁস আন্দোলন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থের চাহিদা লোকের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য ছাপাখানা আবিষ্কার হইল এবং দেখিতে দেখিতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ও লেখাপড়া দ্রুত বাড়িতে লাগিল। এতকাল হাতে লেখা পুস্তকই ছিল লোকের লেখাপড়ার একমাত্র অবলম্বন। চার্চ বা মঠে ধর্মযাজকরা যত্নের সহিত পুঁথি নকল করিতেন। একখানি পুঁথি নকল সম্পূর্ণ করিতে সময় লাগিত অনেক। সকলের পক্ষে এরূপ পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না। সুতরাং শিক্ষা ধর্মযাজকদের মধ্যই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন হইবার ফলে অল্প মূল্যে বহু পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় অনেকের পক্ষেই সুলভে পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব হইল। তখন প্রাচীন সংস্কৃতি ইউরোপের নানাস্থানে সহজে এবং শীঘ্র ছড়াইয়া পড়িল।
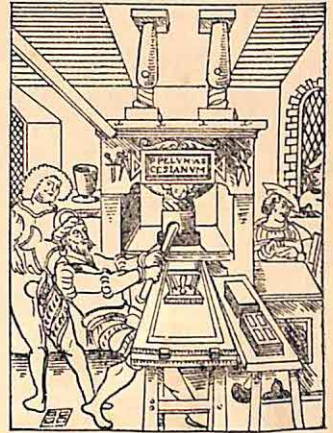
সেকালের মুদ্রাযন্ত্র

**হিউম্যানিষ্ট সাহিত্যের বিকাশ**। সে যুগে যাঁহারা গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, নাট্য, কাব্য ও দর্শন—অর্থাৎ ধর্মের বহির্ভূত বিষয় আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের বলা হইত হিউম্যানিষ্ট। ইঁহাদের চেষ্টাতেই রেনেসাঁস আন্দোলন সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। হিউম্যানিষ্টদের কথা

উল্লেখ করিবার পূর্বে ইটালীর একজন মহাকবি দান্তের নাম স্মরণ করা উচিত। রেনেসাঁস যুগের লোক না হইলেও ইঁহার আবির্ভাবের যুগে ইউরোপের মনোজগতে যে জাগরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল তাহার আভাষ আমরা দান্তের রচনাতে পাই। কিন্তু রেনেসাঁস যুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন পেত্রার্ক। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমেই ইঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনিই ইটালীতে সর্বপ্রথম প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের অপরিসীম সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। পেত্রার্ক তাঁহার সমস্ত জীবন প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া অতিবাহিত করেন। পেত্রার্ক নিজেও ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁহার কার্যের ফলে প্রাচীন সংস্কৃতির ভাবধারার প্রতি ইটালীর শিক্ষিত সমাজে নূতন কৌতূহল ও উদ্দীপনা দেখা দেয়।

এযুগের আর একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন বোকাচিও। "ডেকামেরণ" ছিল তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ইহাতে একশত গল্প ছিল। এই গল্পগুলিতে তিনি সে যুগের সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের জীবনচিত্র আঁকিয়াছেন ; যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে তখন যে দুর্নীতি ছিল, সমাজ জীবনে যে পঙ্কিলতা জমিয়া উঠিয়াছিল তাহা অতি স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তাঁহার কষাঘাতে মধ্যযুগের নীতি ও আদর্শের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বোকাচিও প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের একজন বড় ভক্ত ছিলেন।

ফ্লোরেন্স নগরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে একজন বড় লেখক, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মাকিয়াভেলি। তাঁহার রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'প্রিন্স' নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, রাজনীতিতে নীতি, ও ধর্মের কোন স্থান নাই। বিদেশী শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ ইটালীয়ান রাষ্ট্র

দান্তে

পেত্রার্ক

বোকাচিও

মাকিয়াভেলি

প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা মাকিয়াভেলির মনে ছিল। ইটালীতে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করা যায় তাহাই মাকিয়াভেলি বলিয়াছেন। সেকাল এবং একালে অনেকেই মাকিয়াভেলিকে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

**শিল্প, কলা ও বিজ্ঞান।** রেনেসাঁস যুগ কেবলমাত্র সাহিত্যের বিকাশের জন্যই খ্যাত নয়। এযুগে ললিতকলা, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মানব মনীষার অপূর্ব বিকাশ দেখা যায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালী এবং ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশে চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য এবং শিল্পকলার অত্যাশ্চর্য উন্নতি দেখা যায়। নবজাগরণের উদ্দীপনায় ইটালীর সুদক্ষ শিল্পীরা তাঁহাদের সৌন্দর্যানুভূতি এমন নিপুণভাবে পাথর ও পটের বুকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে ইহার কল্পনাতীত সুষমা আজও বিশ্বের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ সৃষ্টি করিতেছে। লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো ও রাফা-এল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলিয়া পরিচিত ও আদৃত। দা-ভিঞ্চির 'মোনালিসা' ও 'শেষ ভোজন', রাফা-এলের 'ম্যাডোনা' চিত্রাবলী, এবং এঞ্জেলোর অঙ্কিত রোমের সুবিখ্যাত সেণ্টপিটার চার্চের ছাতও প্রাচীর চিত্রাবলী চিত্রশিল্পের অপূর্ব সম্পদ। মাইকেল এঞ্জেলো কেবলমাত্র চিত্রকর ছিলেন না, স্থপতিবিদ্যা এবং ভাস্কর্যে ছিল তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা। রোমের সেণ্টপিটারের প্রধান মন্দিরটি তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহার অনুপম ভাস্কর্য এঞ্জেলোর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। লিওনার্দোর প্রতিভাও ছিল অতি বিস্ময়কর। তিনি একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ছিলেন। আকাশে বিমানবিহারের সম্ভাবনার কথা তাঁহার মনে প্রথম জাগিয়াছিল এবং এপথে তিনি সাফল্য লাভ না করিলেও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি
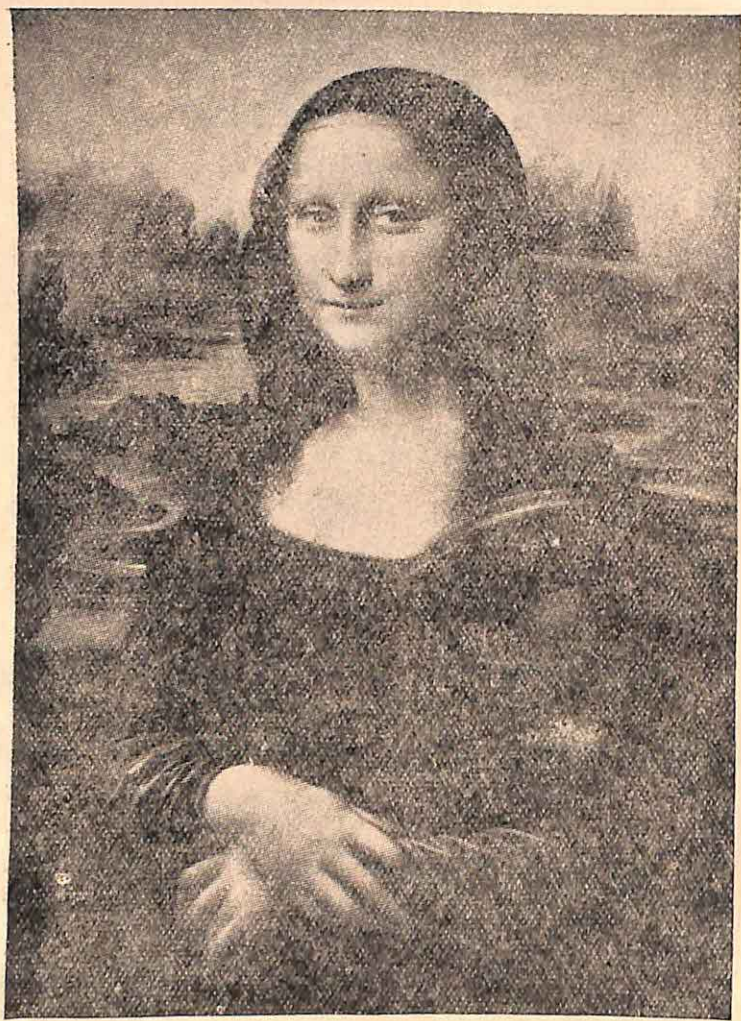
মাইকেল এঞ্জেলো

রাফা-এল

মোনা লিসা : শিল্পী – লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি

শেষ ভোজন : শিল্পী—লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি
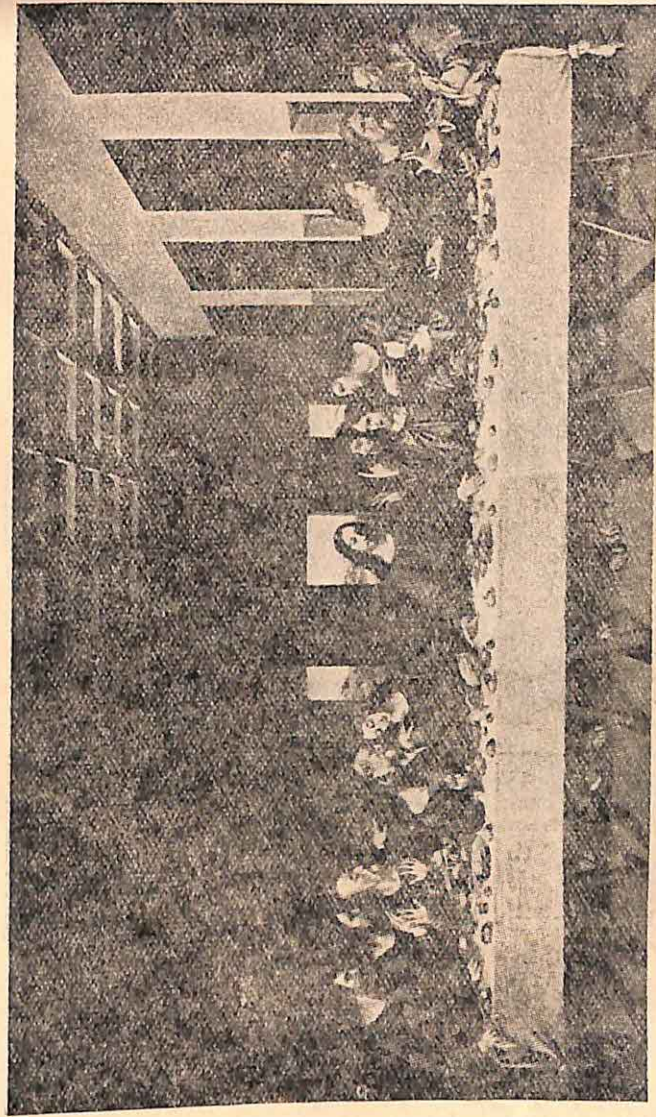
পবিত্র পরিবার ( The Hoiy family ) : শিল্পী—মাইকেল এঞ্জেলো

নোয়ার বলি ( প্রাচীর চিত্র ): শিল্পী—মাইকেল এঞ্জেলো
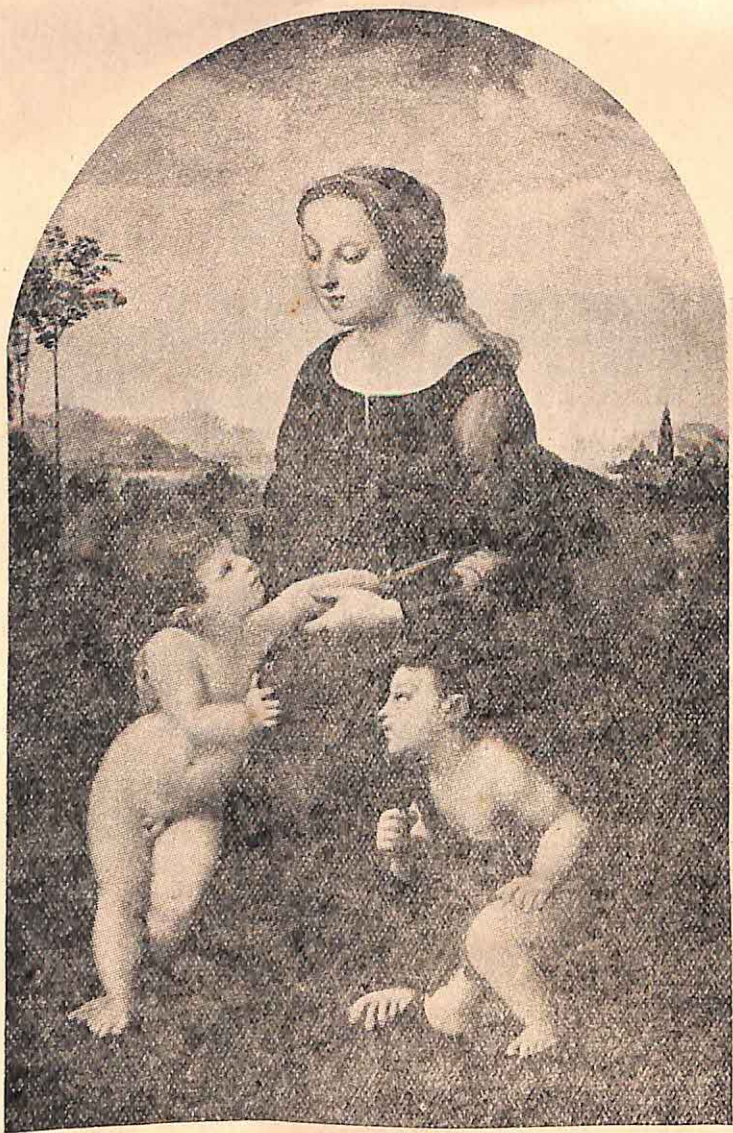
মালিনী ঃ শিল্পী—রাফা-এল

ম্যাডোনো ঃ শিল্পী—রাফা-এল

সেণ্টপিটার গীর্জা
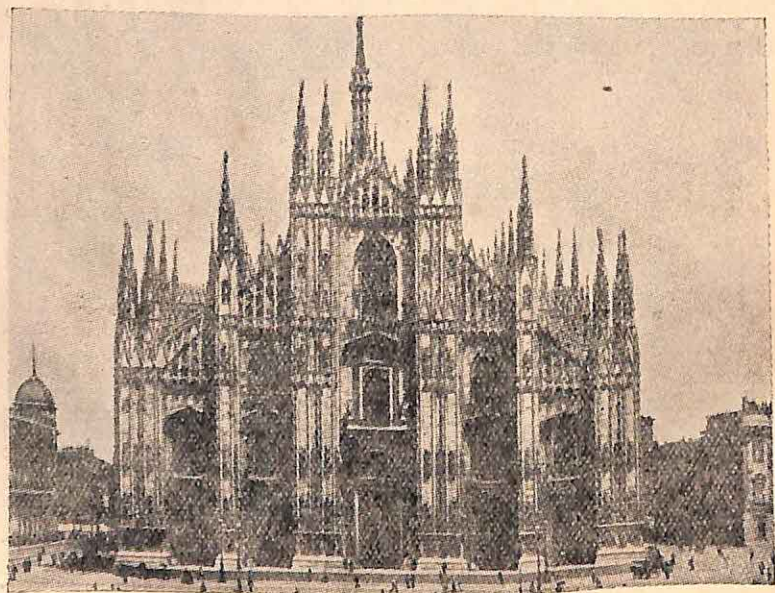
মিলান ভজনালয়

মধ্যযুগের স্থাপত্য শিল্পে গথিক রীতির অনুসরণ করা হয়। কিন্তু রেনেসাঁস্ যুগে আবার প্রাচীন গ্রীক ও রোমান রীতির দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হয়। রোমের সেণ্ট পিটার ধর্মমন্দির, ইংলণ্ডের সেণ্টপল গীর্জা এবং মিলানের সুপ্রসিদ্ধ ভজনালয় এ যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রেনেসাঁস যুগে সাহিত্য ও ললিত কলা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও অগ্রগামী হইতে থাকে। বিজ্ঞান যখন নূতন নূতন সত্য ও তথ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিল তখন চার্চের সঙ্গে তাহার তীব্র বিরোধ বাঁধিল; কারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি চার্চের শিক্ষাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। এজন্য চার্চ চেষ্টা করিত যাহাতে জন-সাধারণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার প্রেরণা না আসে। এ যুগের কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে চার্চ মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিল। এতকাল চার্চের শিক্ষায় মানুষের ধারণা ছিল যে, পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র এবং সূর্য ও গ্রহনক্ষত্র ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কোপার্নিকাস নামে পোল্যাণ্ডের একজন বৈজ্ঞানিক সৌরজগৎ সম্বন্ধে এক নূতন তথ্য প্রচার করিয়া জানাইলেন যে, এ সম্বন্ধে চার্চের ধারণা ভুল। তিনি বলিলেন, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইটালীর আর একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন গ্যালিলিও। তিনি অনেক নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার হইল দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া চার্চের বিদ্বেষ অর্জন করেন। চার্চ তাঁহার বিচারের আয়োজন করে। গ্যালিলিও নিজের মত প্রত্যাহার করিয়া রক্ষা পাইলেন। কিন্তু চার্চের নির্মম অত্যাচারেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হইল না।

কোপার্নিকাস

গ্যালিলিও
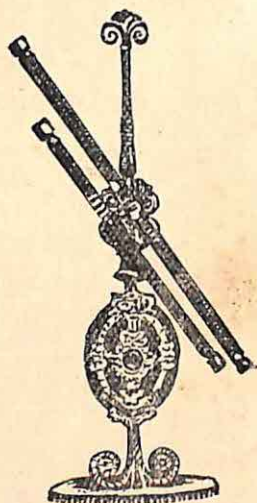
গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র

**রেনেসাঁস আন্দোলনের বিস্তার—হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড।** রেনেসাঁসের প্রভাব শুধু ইটালীতেই আবদ্ধ ছিল না। ইটালী হইতে ইহা পশ্চিম ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড চিত্র বিদ্যায় অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। এযুগে হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে রেমব্র্যাণ্ট, ভ্যান্‌ডাইক্ ও ফ্রান্‌স্ হাল্‌সের নাম করা যাইতে পারে।

টিউডর যুগে রেনেসাঁসের ঢেউ ইংলণ্ডেও পৌঁছিয়াছিল। গ্রোসিন, কোলেট, ইরাসমাস প্রভৃতি সুবিখ্যাত লেখকগণ রেনেসাঁসের ভাবধারা ইংলণ্ডে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এলিজাবেথের রাজত্বকালেই ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে রেনেসাঁসের ভাবধারা পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়ার এলিজাবেথের আমলে আবির্ভূত হন। তাঁহার রচিত নাটকগুলি শুধু ইংরাজী সাহিত্যের নয়, বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও প্রবন্ধ-সাহিত্য লেখক ফ্রান্সিস বেকন তাঁহার রচনাবলীর দ্বারা এযুগে ইংরাজী সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন।

## (খ) রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রেনেসাঁস আন্দোলন ইটালীতে জন্মগ্রহণ করে এবং এখানেই তাহার চরম বিকাশ ঘটে। কিন্তু নবজাগরণের এই ভাবধারা ইটালীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া ছিলনা। ইটালী হইতে ইহা মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে এবং নূতন রূপ ও বৈশিষ্ট্য লইয়া এখানে বিকশিত হইয়া উঠে। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে রেনেসাঁস অনুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিল এবং বিচার ও যুক্তির দ্বারা সত্য নির্ধারণের মনোভাব আনিল।

মা ও ছেলে

শিল্পী ঃ রেমব্র্যাণ্ট

অশ্বপৃষ্ঠে চার্লস ১ম

শিল্পী : ভ্যান্‌ডাইক্

ইরাসমাস

সেক্সপীয়ার

বেকন

ইহার ফলে বিবেক ও যুক্তিবিরুদ্ধ রীতিনীতি, কুসংস্কার ও ধর্মবিধির বিরুদ্ধে লোকের মন সচেতন হইয়া উঠিল। এরূপ মনোভাব হইতেই দেখা দিল ধর্ম সংস্কার আন্দোলন।

**চার্চের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ।** রেনেসাঁস্ আন্দোলন হইবার কিছুকাল পূর্বেই চার্চের মধ্যে নানা দুর্নীতি, কুসংস্কার ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইহার ফলে ধর্মযাজকদের প্রতি লোকের মনে একটা অশ্রদ্ধা ও অসন্তোষের ভাব জমিয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রীক বিদ্যার বহুল প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা জাগে। তখন হইতে চার্চের দুর্নীতি, কুসংস্কার ও অত্যাচার এবং উহার প্রচলিত শিক্ষা ও বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

পোপ ও বড় বড় ধর্মযাজকরা [illegible] কীয় আড়ম্বরে দিন যাপন করিতেন। ইহাদের ঐশ্বর্যও ছিল প্রচুর. পুণ্য অর্জনের জন্য লোকে অনেক সময় ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ও সম্পত্তি দান করিয়া যাইত। পোপ ও ধর্মযাজকরা এই অর্থ ধর্মানুশীলনের জন্য ব্যয় না করিয়া ব্যক্তিগত ভোগ সুখ ও খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অজস্র ব্যয় করিতেন। পোপ ও ধর্মযাজকদের দুর্নীতিপূর্ণ জীবনের প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হিউম্যানিষ্টরাও চার্চের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিলেন যে, চার্চের বহু মত ও নীতি বাইবেলের উপদেশের বিরোধী। চার্চের শিক্ষায় রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানরা বিশ্বাস করিত যে, মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গে যায়। স্বর্গে যাইবার পূর্বে আত্মাকে পাপের গুরুত্ব অনুসারে কিছুকাল পাপ-ক্ষালন লোকে আসিয়া কঠোর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পাপ মুক্ত হইতে হয়। মৃতের আত্মীয়স্বজন যদি আত্মার কল্যাণে প্রার্থনাদি পুণ্য

অনুষ্ঠানের জন্য চার্চের হাতে অর্থ ও সম্পত্তি দান করে তবে আত্মা নির্দিষ্টকাল অতীত হইবার পূর্বেই পাপ-ক্ষালন লোক হইতে মুক্তি পায়। এই বিশ্বাসে অনেকেই চার্চের হাতে প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি দান করিত এবং এই অর্থ-সম্পদ যাজকরা প্রায়ই ভোগ সুখে ব্যয় করিত। আবার পাপ মুক্তির জন্য আর একটি প্রথা এই সময় প্রচলিত ছিল। পোপের আদেশে যাজকরা "শুদ্ধিপত্র" বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। ইহা ক্রয় করিলেই ক্রেতারা যত পাপীই হউক না কেন পাপের দায় এড়াইতে পারিত। এরূপ ফিকির করিয়া ধর্ম-যাজকরা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করিত। অথচ ইহা বাইবেলের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। মানুষ যদি অপরাধ করিয়া সত্য সত্যই অনুতপ্ত হয়, তবে অনুতাপের আগুনে তার সব পাপ ধুইয়া মুছিয়া যায় এবং ভগবান তখন অসীম করুণায় তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন, ইহাই ছিল বাইবেলের শিক্ষা। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ইউরোপের একদল মনীষী চার্চের অনাচার ও দুর্নীতি দূর করিবার জন্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করিলেন; কোথাও কোথাও ধর্মদ্রোহ দেখা দিল। চার্চ রাজশক্তির সাহায্যে ইহা কঠোর ভাবে দমন করিল। ফলে চার্চের বিরুদ্ধে লোকের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল।

**মার্টিন লুথার ও সংস্কার আন্দোলন।** যোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার নামক একজন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষের নেতৃত্বে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জার্মানীতে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানীতে মার্টিন লুথার জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া মঠে প্রবেশ করেন এবং কিছুকাল পরে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এই সময় পোপের নির্দেশে টেট্‌জেল নামে একজন সন্ন্যাসী

জার্মানীতে ঘুরিয়া শুদ্ধিপত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে-ছিলেন। লুথার দেখিলেন, ইহা কেবল লোক ঠকাইয়া অর্থ আদায় করিবার ফন্দি। তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। পোপ তাঁহাকে প্রতিবাদ প্রত্যাহার করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু লুথার ইহাতে রাজী হইলেন না। তখন পোপ তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং জার্মানীর কয়েকজন রাজাকে আদেশ করিলেন, লুথারকে শাস্তি দিতে। জার্মানীর রাজারাও অনেকে তখন পোপের প্রভুত্ব পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল লুথারের প্রতি; সুতরাং তাঁহারা কেহ লুথারের বিরুদ্ধে গেলেন না। লুথার ও পোপের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ আরম্ভ হইল। জার্মানীর বহু রাজা ও সাধারণ লোক লুথারের পক্ষ অবলম্বন করিল।

মার্টিন লুথার

এই সময় লুথার বাইবেল দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ কারলেন এবং নিজের ধর্মমত সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাইবেলের উপদেশ ছিল লুথারের ধর্মমতের ভিত্তি। লুথার যে ধর্মপ্রচার করিলেন তাহা প্রোটেষ্টাণ্ট মত বলিয়া খ্যাত হইল। তাঁহার শিষ্যরাও প্রোটেষ্টাণ্ট বলিয়া পরিচিত হইল। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়া নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইল প্রোটেষ্টাণ্ট মত। প্রতিবাদ কথাটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হইল প্রোটেষ্ট। চার্চের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ। ক্রমে ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম জার্মানীর এক অংশে,

ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে ছড়াইয়া পড়িল। খৃষ্টীয় জগৎ দুইভাগে বিভক্ত হইল।

**অন্যান্য সংস্কারক।** রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে আরও কয়েকজন সংস্কারকের এই সময় আবির্ভাব হয় এবং তাঁহাদের সহিতও রোমান চার্চের বিচ্ছেদ ঘটে। ইহারাও লুথারের ন্যায় নূতন ধর্মসম্প্রদায় গঠন করেন। ইহাদের মধ্যে ক্যালভিন ও জুইংলি ছিলেন প্রধান। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ক্যালভিন ফরাসী দেশে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। জনসাধারণ যাহাতে বাইবেলের উপদেশ জীবনে মানিয়া চলে ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশের মূল কথা। ফরাসী দেশের রাজার বিরোধিতায় তিনি দেশ ছাড়িয়া সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জেনিভা নগরে আশ্রয় লইলেন এবং ২৮ বৎসর পরে এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ক্যালভিনের ধর্মমত লুথারের মতবাদ হইতে আরও কঠোর ও উগ্র ছিল। তাঁহার শিষ্যরা পিউরিটান বা শুচিবাদী নামে খ্যাত ছিল। জেনিভাতে তিনি বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে জেনিভার ধর্মগুরু ও শাসক ছিলেন। পিউরিটানদের অতি কঠোর নৈতিক জীবনযাপন করিতে হইত। নৃত্যগীত, তরল আনন্দউৎসব, জঁাকাল পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি একেবারে বারণ ছিল। রবিবারে সকলের প্রার্থনা অথবা ধর্মকার্য করিয়া কাটাইতে হইত। এই সকল নিয়মের অন্যথা করিলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত।

ক্যালভিন

জুইংলি ছিলেন সে যুগের আর একজন প্রধান ধর্মসংস্কারক। তিনিও পোপ ও রোমান চার্চের কর্তৃত্ব ও ধর্মনীতি অস্বীকার করিয়া নিজের শিষ্যদের লইয়া পৃথক একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। সুইট্জারল্যাণ্ডের জুরিক নগরে তিনি বাস করিতেন। জুইংলির মতবাদ ক্যালভিনের ন্যায় অত উগ্র ছিল না।

**ইংলণ্ডে সংস্কার আন্দোলন বিস্তার।** সংস্কার আন্দোলন ক্রমে ইংলণ্ডেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে ইংলণ্ডের কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি চার্চের সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করিতে থাকেন। কিন্তু তখনও রোমান চার্চের সহিত বিচ্ছেদের কথা কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু ৮ম হেনরীর রাজত্বকালে অতি সামান্য কারণ উপলক্ষ করিয়া ইংলণ্ডের চার্চ পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া আলাদা হইয়া গেল। কিন্তু তখনও ইংলণ্ড রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত ত্যাগ করে নাই। কিন্তু ধর্ম ব্যাপারে ইংলণ্ড পোপের কর্তৃত্বে অস্বীকার করায় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম বিস্তারের পথ সুগম হইল। ইহার পর হেনরীর আদেশে বাইবেল ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইল। তাহার পর হেনরী ইংলণ্ডের মঠগুলি ধ্বংস করিয়া ইহার সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইলেন। তাঁহার এই সব কার্যের ফলে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িল এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল।

**সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল।** মধ্যযুগে সমস্ত ইউরোপ ধর্ম-বিষয়ে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধীন ছিল। পোপ ছিলেন খৃষ্টান সমাজের ধর্মগুরু। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, মানিত। সুতরাং চার্চ সমস্ত ইউরোপকে এক অখণ্ড ঐক্যের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপের এই ঐক্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল এবং ধর্মমত লইয়া ইউরোপ বিভক্ত হইয়া

গেল। দুইটি ধর্মমত তখন ইউরোপে পাশাপাশি চলিতে লাগিল—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। প্রোটেষ্টাণ্টরা আবার কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। ইহাদের কাহারও মধ্যে বনিবনাও ছিল না। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের লোকদের পীড়ন করিত। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা তখন ইউরোপে ছিল না। রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়গুলিকে একেবারে উচ্ছেদ করিবার জন্য নানা কঠোর উপায় অবলম্বন করিল। এই ধর্মদ্বন্দ্ব উপলক্ষ করিয়া ইউরোপে প্রচণ্ড যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধে ইউরোপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবার ফলে এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ পরধর্মসহিষ্ণু। ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন মত ও পথ ভারতবর্ষ চিরদিন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এজন্য ধর্ম-বিরোধ ভারতবর্ষে বড় দেখা দেয় নাই। কোন কোন রাজা পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন ; কিন্তু অপর ধর্ম উচ্ছেদ করিবার জন্য কোন ব্যাপক প্রয়াস তাঁহারা করেন নাই। মুসলমান যুগে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিয়াছে। কোন কোন মুসলমান রাজা হিন্দুদের প্রতি নির্মম অত্যাচার করিয়াছেন, জোর করিয়া হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ রাজাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। মোটামুটি কর নিয়মিত পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন ; প্রজাদের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারা বিশেষ হাত দিতেন না। ভারতের ন্যায় চীন দেশেও ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইত। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় শান্তিতে পাশাপাশি বাস করিত। ধর্ম সম্বন্ধে ইউরোপে যে বর্বরতা চলিয়াছে ভারত এবং চীনে তাহা কখনও দেখা যায় নাই।

## কালপঞ্জী

| | খৃষ্টাব্দ |
|---|---|
| দান্তে ... | ১২৬৫—১৩২১ |
| পেত্রার্ক ... | ১৩০৪—১৩৭৪ |
| কনষ্টান্টিনোপলের পতন | ১৪৫৩ |
| প্রথম মুদ্রিত পুস্তক | ১৪৪৬ |
| লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি | ১৪৫২—১৫১৯ |
| মাইকেল এঞ্জেলো | ১৪৭৫—১৫৬৪ |
| রাফা-এল ... | ১৪৮৩—১৫২০ |
| কোপার্নিকাস ... | ১৪৭৩—১৫৪৩ |
| গ্যালিলিও ... | ১৫৬৪—১৬৪২ |
| সেক্সপিয়ার ... | ১৫৬৪—১৬১৬ |
| মার্টিন লুথার ... | ১৪৮৩—১৫৪৬ |
| ক্যালভিন ... | ১৫০৯—১৫৬৪ |

( ২ )

# ভৌগোলিক আবিষ্কার যাত্রা ও বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যখন রেনেসাঁস্ ও রিফর্মেশন আন্দোলনের ফলে এক নূতন ইউরোপ জন্মগ্রহণ করিতেছিল, সেই সময় ইউরোপীয় নাবিকগণ সমুদ্রপথ বাহিয়া আমেরিকা মহাদেশে উপস্থিত হইল এবং ভারতবর্ষ ও পূর্ব-এশিয়ার সহিত সমুদ্রপথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক যুগান্তর সৃষ্টি করিল। এই সকল ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে প্রায় সমগ্র বিশ্বে ইউরোপীয় অধিকার ও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

**ভৌগোলিক জ্ঞান বিস্তার ও নূতন বাণিজ্য পথের সন্ধান।** খৃষ্টান ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এ যুগের ভৌগোলিক আবিষ্কার যাত্রার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই সময়ে ইউরোপের খৃষ্টান রাজা ও যাজকরা পৌত্তলিক দেশগুলিতে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। বাণিজ্যের পথ ধরিয়াই খৃষ্টান ধর্ম অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও এ যুগের নাবিকদের প্রেরণা দিয়াছে ও তাহাদের দুঃসাহসিক অভিযানকে সার্থক করিয়াছে আরও কয়েকটি কারণ। মধ্যযুগে মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। সমুদ্র-পথে প্রাচ্যদেশে যাইবার পথ তখন অজানা ছিল। আবার অজ্ঞাত দেশ ও অজানা সমুদ্রপথ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভীতিজনক কাহিনীও সেকালে প্রচলিত ছিল। সুতরাং সহজে কেহ অজানা সমুদ্রপথে বাহির হইতে চাহিত না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে মানুষের ভৌগোলিক

জ্ঞান অনেক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পৃথিবী গোলাকার এ সত্য তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং লঘিমা ও দ্রাঘিমা হিসাব করিয়া, বিভিন্ন দেশের অবস্থান নির্ণয় করিয়া পৃথিবীর একটি মানচিত্রও বৈজ্ঞানিকরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আবার দিক-নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার এবং সাগরের উপর দিয়া বিভিন্ন দেশে যাতায়াত পথেরও মানচিত্র সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সমুদ্র পথে দূর দূর দেশে যাতায়াত করা অনেক সহজ ও নিরাপদ হইয়াছিল।
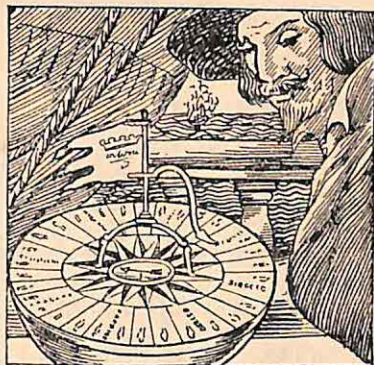
১৪৯২ সালের কম্পাস

ক্রুশেডের যুদ্ধকালে ইউরোপের সহিত প্রাচ্য দেশের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হইল এবং দুই মহাদেশের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিতে লাগিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভেনিস নগর হইতে মার্কোপোলো চীনে আসেন। একাদিক্রমে ষোল বৎসর চীনে বাস করিয়া তিনি সমুদ্রপথে ভারত ও পারস্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার নিকট প্রাচ্যদেশের অপরিসীম ধন-সম্পদের কাহিনী শুনিয়া ইউরোপীয় বণিকদের প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করিতে যাইবার আগ্রহ আরও বাড়িয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য চলিত। মধ্যযুগেও প্রাচ্যদেশের বণিকরা জলপথে ও স্থলপথে আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া হইয়া ইউরোপের সহিত বাণিজ্য করিতে আসিত। ইউরোপের খৃষ্টান বণিকরাও এশিয়ায়

কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইটালীয়ান নাবিক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। কৃষ্টোফার কলম্বাস নামে জেনোয়ার একজন নাবিক আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিত হইবার নূতন পথ আবিষ্কারের পরিকল্পনা করিলেন। ইহাতে তিনি স্পেনরাজের আনুকূল্য লাভ করিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিনখানি জাহাজে একশত লোক লইয়া তিনি রওনা হইলেন। তিনমাস পরে পূর্ব এশিয়ার পথ খুঁজিতে যাইয়া তিনি আমেরিকা মহাদেশের অনতিদূরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইলেন (১৪৯২)। এইরূপে আমেরিকা মহাদেশের কথা পৃথিবীর লোক প্রথম জানিল। কলম্বাস কিন্তু তখনও ইহাকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন ইণ্ডিজ্। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কয়েক বৎসর পরে সপ্তম হেনরীর রাজত্বকালে ইটালীয়ান নাবিক জন ক্যাবট ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্র পাড়ি দিয়া উত্তর আমেরিকা পৌঁছিলেন (১৪৯৭)। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিগো নামে একজন ইটালীয়ান নাবিক আটলান্টিক পাড়ি দিয়া ব্রেজিলে উপস্থিত হইলেন এবং নব মহাদেশের একটি বিবরণ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার নাম হইতেই নব মহাদেশের নাম হইল আমেরিকা।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে (১৫১৯-২২) ম্যাগেল্লান নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ নাবিক স্পেন সম্রাট ৫ম চার্লসের অনুমতি লইয়া পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিবার নূতন পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সাগর পথে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া তিনি কয়েকমাস পরে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত সংকীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে আসিয়া পড়িলেন। তারপর আরও পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া অবশেষে বর্তমান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। এখানে বর্বর জাতির হাতে

ম্যাগেল্লান প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার নৌবহরের একখানি জাহাজ ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়া আফ্রিকা ঘুরিয়া প্রায় তিন বৎসর পরে স্পেনে ফিরিয়া আসিল। এই প্রথম নৌযোগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইল।

এ যুগের আবিষ্কার যাত্রায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল ইটালীর নাবিকগণ। ইংরাজ, ওলন্দাজ ও স্পেনীয়দের ইহাতে বিশেষ কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও ইহার ফলে লাভ হয় তাহাদের সবচেয়ে বেশি। ইহারা আবিষ্কার যাত্রায় ইটালীয়ান নাবিকদের সাহায্য করিয়াছিল।

**স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে বিরোধ—পোপের বিধান।** পঞ্চদশ শতকের অত্যাশ্চর্য ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পর্তুগাল ও স্পেন প্রবল হইয়া উঠিল এবং ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। দুইটি ক্যাথলিক শক্তির মধ্যে বিবাদ বন্ধ করিবার জন্য পোপ ষষ্ঠ আলেক-জান্দার উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত একটি কাল্পনিক রেখা আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া টানিয়া দেন। তারপর তিনি এক বিধান জারি করেন যে, এই রেখার পশ্চিমে অবস্থিত পৃথিবীর সমস্ত অখৃষ্টান অঞ্চলের উপর স্পেন অধিকার বিস্তার করিবে এবং ইহার পূর্বদিকের সমস্ত অঞ্চল পর্তুগীজরা দখল করিতে পারিবে। এইরূপে পোপ স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। ইউরোপ ছাড়া প্রায় সারা পৃথিবীই পোপ এইভাবে বিলাইয়া দিলেন।

পোপের এই বিধান ঘোষিত হইবার পরে পর্তুগাল প্রাচ্যদেশে দ্রুতবেগে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের বহু দ্বীপে পর্তুগীজদের বাণিজ্য কুঠি ও দুর্গ স্থাপিত হইল এবং অল্পকাল মধ্যেই

বাণিজ্য করিতে যাইত। তুর্কীরা যখন পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়িয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিল তখন তাহারা খৃষ্টান বণিকদের প্রাচ্য-দেশে বাণিজ্য করিবার পথে নানা বাধা সৃষ্টি করিল। এই সময় ইউরোপ ও প্রাচ্যদেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রধানতঃ আরব বণিকদের হাতে গেল।

ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দর ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে নানাবিধ পণ্য লইয়া তাহারা ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলিতে উপস্থিত হইত এবং এখান হইতে ইটালীর বণিকরা তাহাদের নিকট হইতে পণ্য লইয়া সারা ইউরোপে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিত। ইটালীর জেনোয়া, ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি নগরগুলি এই সময় হইতে ব্যবসাবাণিজ্যে অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

প্রাচ্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া ইটালী এত লাভবান হইতেছে দেখিয়া স্পেন ও পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের বণিকরা প্রাচ্য-দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন যে পথে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য চলিত তাহা সম্পূর্ণরূপে আরব ও ইটালীর বণিকদের হাতে ছিল। তাহারা এপথে অন্যান্য দেশের বণিকদের আসিতে দিত না। সুতরাং অন্যান্য দেশের লোকেরা প্রাচ্য-দেশে যাইবার নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। এই সময় পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনীত নানাবিধ সুগন্ধ মশলার খুব আদর ইউরোপে দেখা দিয়াছিল এবং ইহা খুব চড়া দরে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় হইত। এ অঞ্চল ইউরোপে মশলার দ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। সরাসরি এই অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য করিবার আগ্রহও ইউরোপের কয়েকটি জাতির মধ্যে খুব দেখা দিয়াছিল।

**পর্তুগীজ নাবিকদের আবিষ্কার যাত্রা।** প্রাচ্যদেশে যাইবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল পর্তুগাল হইতে। প্রিন্স হেনরী ছিলেন পর্তুগালের রাজবংশের সন্তান। সমুদ্রপথে যাত্রা

করিয়া অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের অদম্য স্পৃহা তাঁহার ছিল। এই কারণে এবং প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য দ্বারা নিজের দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূল ঘুরিয়া পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছাইবার চেষ্টা কয়েকবার করিয়া ব্যর্থ হন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বার্থলোমিউ দিয়াজ নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া মহাদেশের একেবারে দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হন। ইহার নয় বৎসর পরে আর একজন পর্তুগীজ নাবিক, ভাস্কো-দা-গামা, আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট নামক স্থানে উপস্থিত হন। এখান হইতে তিনি বহু মূল্যবান দ্রব্য লইয়া পর্তুগালে ফিরিয়া যান। ইহার পরেই পর্তুগালের সহিত ভারতের নিয়মিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং বাণিজ্যে পর্তুগালের খুব লাভ হইতে লাগিল। ইহার পর পর্তুগীজরা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সুদূর চীনের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল এবং সর্বত্র বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পর্তুগাল এই অঞ্চলের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখিয়াছিল।

ভাস্কো-দা-গামা

**স্পেনের প্রচেষ্টা**। পর্তুগালের দেখাদেখি স্পেনও প্রাচ্য দেশে আসিবার সমুদ্রপথ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। স্পেনের এই প্রচেষ্টায়

গ্রীনল্যাণ্ড
আটলাণ্টিক মহাসাগর
ইংলণ্ড
উত্তর আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
ফ্রান্স
স্পেন
মঙ্গোলিয়া
পিকিং
জাপান
প্রশান্ত মহাসাগর
ভার্জিনিয়া
ফ্লোরিডা
নিউ স্পেন
ওরমুজ
ক্যামবে
দিউ
ভারত
চীন
ম্যাকাও
ইষ্ট ইণ্ডিজ
ফিলিপাইন
আফ্রিকা
প্রশান্ত মহাসাগর
পোর্টো বেলো
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ
দক্ষিণ আমেরিকা
মোম্বাসা
মোজাম্বিক
সুমাত্রা
জাভা
নিউ গিনি
ভারত মহাসাগর
মাদাগাস্কার
অষ্ট্রেলিয়া
আটলাণ্টিক মহাসাগর
উত্তমাশা অন্তরীপ
তিয়েরা ডেল ফিউগো
ম্যাগেলান প্রণালী
পর্তুগীজ
ভাস্কোডাগামা ১৪৯৭-৯৮
বাণিজ্য পথ
ইংলিশ
জন ক্যাবট ১৪৯৭-৯৮
ড্রেক ১৫৭৭-৮০
স্পেন
কলম্বাস ১৪৯২
ম্যাগেল্লান ১৫১৯-২২
বাণিজ্য পথ
মার্কোপোলো ১২৭১-৯৫


আবিষ্কার যাত্রা
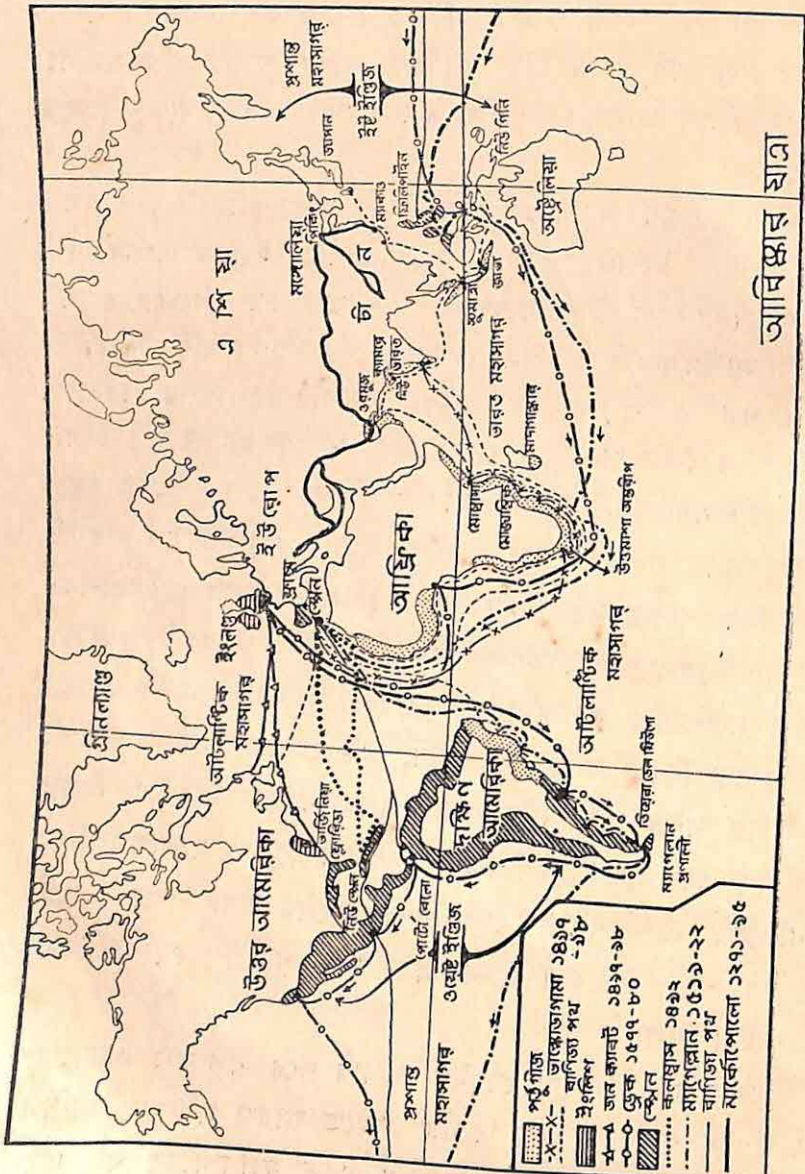
উভয় মহাদেশ জুড়িয়া পর্তুগীজদের একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের অভ্যুত্থানের ফলে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। এদিকে স্পেনও ধীরে ধীরে আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নব-মহাদেশে আর একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। স্পেন ও পর্তুগাল হইল তখন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ।

**স্পেনের সাম্রাজ্য বিস্তার—মেক্সিকো ও পেরু।** ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ( ১৫১৯ ) কর্টেজ নামে একজন অতি দুঃসাহসিক স্পেনীয় সৈনিক একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অতর্কিত আক্রমণ করিয়া মেক্সিকো দেশ জয় করিলেন। এদেশের বহু যুগ ধরিয়া সঞ্চিত সোনা, রূপা ও ধনরত্ন তাঁহার হাতে আসিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ( ১৫৩১ ) পিজারো নামে আর একজন স্পেনীয় সৈনিক দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশ জয় করিয়া লইলেন। মেক্সিকো ও পেরু উভয় দেশেই বহু সোনা ও রূপার খনি ছিল। স্পেনের অধিকারে আসিবার পরে এই দেশগুলি হইতে জাহাজ ভর্তি হইয়া সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু এবং তামাক, চিনি প্রভৃতি পণ্য স্পেনে আসিতে লাগিল। ফলে স্পেনের ঐশ্বর্যের সীমা রহিল না। স্পেনীয় আক্রমণের ফলে মেক্সিকো ও পেরুর অতি প্রাচীন সভ্যতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। কালক্রমে স্পেন মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল।

**অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার।** কিন্তু স্পেনের এ প্রভাবপ্রতিপত্তি বেশি দিন স্থায়ী হইল না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হল্যাণ্ড স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া

স্বাধীন হইল। ইহার পর বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার লইয়া স্পেনের সহিত হল্যাণ্ডের তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিল। কালক্রমে স্পেন ও পর্তুগালকে যুদ্ধবিগ্রহে পরাজিত করিয়া হল্যাণ্ড এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর-আমেরিকার কয়েকটি অঞ্চল জুড়িয়া একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। এই শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়েই শক্তিশালী হইয়া বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে ইংরাজ ও ফরাসীরা এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিল এবং কালক্রমে বিশ্বব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিল।

**আবিষ্কার যাত্রার ফলাফল।** মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল ছিল ইউরোপে ও এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। এশিয়ার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল তখন ইটালীর নগর-গুলির হাতে। কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বৈদেশিক বাণিজ্য ভূমধ্যসাগরের উপকূলের দেশগুলির হাত হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলির হাতে চলিয়া গেল। ইহার ফলে ইটালীর পতন ঘটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল। এ যুগের ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে একদিকে আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশ ও সভ্যতার বিস্তার ঘটিল, আর একদিকে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় আধিপত্য স্থাপিত হইল। সমস্ত বিশ্বের ঐশ্বর্য আহরণ করিয়া ইউরোপীয় দেশগুলি ধনসম্পদে পৃথিবীতে অতুলনীয় হইয়া উঠিল এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়া মানব সভ্যতার এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনিল।

কলম্বাস



কলম্বাসের জাহাজ সাণ্টা মারিয়া
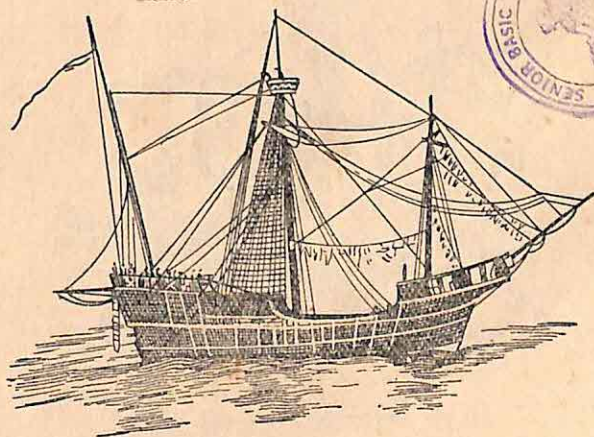
ম্যাগেল্লান

ম্যাগেল্লানের জাহাজ

## কালপঞ্জী

প্রিন্স হেনরী—১৩৯৪—১৪৬০

বার্থলোমিও দিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার—১৪৮৭

কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার—১৪৯২

ভাস্কো দা গামার প্রথম ভারত আগমন—১৪৯২

ম্যাগেল্লানের ভূ-প্রদক্ষিণ—১৫১৯—১৫২২

আমেরিগোর ব্রেজিল আগমন—১৫০০

কার্টেজের মেক্সিকো জয়—১৫১৯

পিজারোর পেরু আগমন—১৫৩১

---

# মুঘল ভারত

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাটগণ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন চিঙ্গিস ও তায়মুর বংশের বাবর এবং ইহা দৃঢ়মূল করেন মহামতি আকবর।

**মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।** এগার বৎসর বয়সে বাবর মধ্য এশিয়ার ফরগণা রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। তারপর শত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণে পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি নিজের প্রতিভাবলে কাবুল রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ( ১৫২৬ ) তিনি পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। ইহার পর বাবর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া পশ্চিমে আফগানিস্তান হইতে পূর্বে বাংলাদেশ এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে গোয়ালিয়র পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেন। বাবর মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যে তিনি ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাবরের মৃত্যুর পরে

বাবর

তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসন লাভ করিলেন। কিন্তু রাজা হইয়াই তাঁহাকে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য বিহারের শক্তিশালী আফগান নায়ক শেরশাহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই শেরশাহের হাতে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন রাজ্য ছাড়িয়া অতিকষ্টে পারস্যে পলায়ন করিলেন। সেখানে পারস্যের রাজা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। শেরশাহ দিল্লীতে সম্রাট হইয়া বসিলেন। ভারতে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

হুমায়ুন

শেরশাহ

**শেরশাহ**। দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া শেরশাহ মাত্র পাঁচ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। এই অল্প-কালের মধ্যেই তিনি সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সুশাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রজার কল্যাণের জন্য তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। হিন্দু-মুসল-মানের মধ্যে তিনি কোন ভেদ করিতেন না। শেরশাহের শাসন-ব্যবস্থা এত সুন্দর ও কল্যাণমূলক

ছিল যে, আকবর সম্রাট হইয়া তাঁহারই আদর্শে সাম্রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করেন।

শেরশাহের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সুযোগে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন দখল করিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই হুমায়ুনের মৃত্যু হইল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া মুঘল ও পাঠানে ( আফগান ) আবার বিবাদ বাধিল। আকবর পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রপৌত্র ঔরংজীবের মৃত্যু হয়। এই দেড়শত বৎসর কাল ভারতে মুঘল-শাসনের গৌরবময় যুগ। এই যুগে মুঘল সাম্রাজ্য প্রায় সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ইহার শক্তি, সমৃদ্ধি ও যশ সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া যায়।

আকবর

**আকবর।** ভারতে যে সকল মুসলমান সম্রাট রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন আকবর ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সমসাময়িক লেখকরা তাঁহার চেহারার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার গড়ন ছিল দোহারা, নাতি-দীর্ঘ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রশস্ত ললাট ও বক্ষ, দীর্ঘ বাহু, সদা প্রফুল্ল সদয় মুখ। সমস্ত লইয়া একটা রাজকীয় মহিমা যেন তাঁহার চেহারা হইতে ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার দৈহিক

শক্তি ও কর্মক্ষমতা ছিল অসামান্য। সমস্ত দিন তিনি অশ্বারোহণে অতিবাহিত করিতে পারিতেন; ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি আসিত না। প্রতিদিন তিনি তিন চারি ঘণ্টার বেশি ঘুমাইতেন না। বাকি সময় নানাবিধ কাজ লইয়া থাকিতেন। তাঁহার মন ছিল চিন্তাশীল ও সদাজাগ্রত। নূতন নূতন বিষয় জানিবার ও শিখিবার অদম্য কৌতূহল তাঁহার ছিল। জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের পণ্ডিতদের সঙ্গে সর্বদা মিশিতেন, নানা তুরূহ বিষয় আলোচনা করিতেন। ফতেপুরসিক্রীতে ইবাদৎ খানা নামক গৃহে তিনি বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের সহিত সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় অনেক সময় নিমগ্ন থাকিতেন। লেখাপড়া না শিখিলেও আকবর অতি বিজ্ঞ ছিলেন। আলোচনা কালে তিনি যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিতেন তাহাতে পণ্ডিতরাও বিস্মিত হইতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। একবার যাহা শুনিতেন তাহা ভুলিতেন না; রাজ্যের সমস্ত খবর তাঁহার নখদর্পণে ছিল। রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা হিসাবেও তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল।

**আকবরের ধর্মমত**। আকবরের ধর্মমতও ছিল খুব উদার। সকল ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে এবং ভগবানকে লাভ করাই সকল ধর্মের লক্ষ্য একথা তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। সকল ধর্মের সারমর্ম লইয়া তিনি একটি নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা 'দীন ইলাহী' নামে পরিচিত। মোটামুটি ইহার মূল কথা ছিল এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস। সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে বিরোধ দূর করিয়া ভারতবাসীকে এক ধর্মসূত্রে বাঁধিবার জন্যই তিনি এই নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু জোর করিয়া কাহারও উপর এ ধর্ম চাপাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই।

**মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার।** আকবর প্রায় পঞ্চাশ বৎবর রাজত্ব করেন। জীবনের অধিকাংশ কাল তাঁহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। তিনি যখন স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন পশ্চিমে পঞ্জাব হইতে পূর্বে এলাহাবাদ এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে গোয়ালিয়র পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তারপর সারাজীবন যুদ্ধ করিয়া তিনি একে একে মালব, গোণ্ডয়ানা, মেবার ব্যতীত সমস্ত রাজপুতানা, গুজরাট, বাংলা, উড়িষ্যা, সিন্ধু, কাশ্মীর, কাবুল, কান্দাহার, বেলুচিস্থান, খান্দেশ ও আহমদনগর রাজ্যের একাংশ জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরবর্তী সম্রাটদের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের এক বৃহৎ অংশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। শাহজহান মধ্য এশিয়ায় তাঁহার পিতৃপুরুষদের রাজ্য বল্‌খ্‌ ও বদখ্‌সান জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু এক বৎসরের বেশি তিনি ইহা অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। শাহ্‌জহানের পুত্র ঔরংজীবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য শক্তি ও খ্যাতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে মুঘল সেনাপতি মীরজুমলা আসাম ও কোচবিহার জয় করিলেন। সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ আরাকানের মগদিগকে পরাজিত করিয়া সন্দীপ ও চট্টগ্রাম দখল করিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ঔরংজীব দুইটি রাজ্যই পুনরায় জয় করিয়া লইলেন।

**সাম্রাজ্যের পতন।** ঔরংজীবের আমলেই মুঘল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটিয়াছিল। আবার তাঁহারই রাজত্বকালে তাঁহার অনুদার নীতির ফলে চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল; পঞ্জাবে শিখরা বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল; বুন্দেলখন্দে

রাজা ছত্রসাল মুঘল বশ্যতা অস্বীকার করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন ; মথুরায় জাঠরা বিদ্রোহী হইল ; রাজপুতানায়ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মেবার ও মারবারের মিলিত শক্তিকে পরাজিত করিতে না পারিয়া ঔরংজীব অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি রাজত্বের শেষ পঁচিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে কাটাইলেন, কিন্তু কিছুতেই মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরাশা, ক্ষোভ ও কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। আহমদনগরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্বল বংশধরদিগের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে মুঘল বাদশাহের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। দিল্লীর সাম্রাজ্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া দিল্লী ও তাহার চারিপাশের সামান্য কতকটা অঞ্চল লইয়া নামমাত্র টিকিয়া রহিল।

জাহাঙ্গীর

**জাহাঙ্গীর।** আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করিলেন। শাসনকার্যে তিনি ও আকবরের উদার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তিনিও সুপুরুষ এবং পিতার ন্যায় বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিকার ভালবাসিতেন এবং নিপুণ সেনাপতি ছিলেন। ফারসী, হিন্দী ও তুর্কী ভাষায় তাঁহার

অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তুর্কী ভাষায় তিনি একখানি আত্ম-জীবনী রচনা করেন। চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা, উদ্যান রচনা ও অন্যান্য সুকুমার শিল্পের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। জাহাঙ্গীরের আর একটি বড় গুণ ছিল তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা। সকল প্রজা যাহাতে তাঁহার নিকট ন্যায়বিচার পায় এজন্য তিনি দরবার গৃহের বাহিরে লোহার শিকলে কয়েকটি ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রজারা যে কোন সময়ে ঘণ্টা বাজাইয়া বাদশাহের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। প্রজাদের সহিত তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। জাহাঙ্গীর সকালে প্রজাদের দর্শন দিতেন, দুপুরে হাতির লড়াই ও অন্যান্য পশুর খেলা দেখিতেন, বিকালে প্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন এবং সন্ধ্যার পর মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করিতেন। জাহাঙ্গীরের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা ছিল মদ্যপান। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তিনি কর্মবিমুখ ও উদ্যমহীন হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সুন্দর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

শাহ্‌জহান

**শাহ্‌জহান।** জাহাঙ্গীরের পরে বাদশাহ হইলেন শাহ্‌জহান। তাঁহার গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ, প্রশস্ত ললাট, সুগঠিত নাসা, স্নিগ্ধ কৃষ্ণচক্ষু ও হাস্যময় মুখশ্রীর মধ্যে রাজকীয় মহিমা প্রকাশ পাইত। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবহারও ছিল অতি মার্জিত। শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল।

শিকার, যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনায় তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। সেকালে হাতীর লড়াই হইত। শাহ্‌জহান অস্ত্র লইয়া হাতীর সহিত লড়িতে ভালবাসিতেন। নানাবিধ গুণে ভূষিত হইলেও শাসক হিসাবে শাহ্‌জহান খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই। রাজ্য-শাসনে আকবরের উদার নীতি তিনি অনুসরণ করেন নাই। ধর্মের গোঁড়ামি তাঁহার ছিল। তিনি নিজে ছিলেন সুন্নী মুসলমান। সিয়া মুসলমান ও হিন্দুদের উপর তিনি অত্যাচার করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়াছেন। শাহ্‌জহান জাঁকজমক ও আড়ম্বর ভালবাসিতেন এবং এজন্য অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন।

**ঔরংজীব।** ঔরংজীব ছিলেন মুঘল বংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট। শাহ্‌জহানের পুত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দক্ষ ও বিজ্ঞ। তাঁহার রাজনীতিজ্ঞান ছিল অসামান্য এবং কূটনীতিতেও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধ তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন করিয়াছিল। সম্রাটের সম্মুখে কেহ কোন প্রগল্‌ভতা দেখাইতে সাহস পাইত না। তিনি নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান ছিলেন এবং কঠোরতার সহিত ধর্মের অনু-শাসন ও অনুষ্ঠান পালন করিতেন। তিনি অতি নিরলসভাবে রাজকার্য সম্পাদন করিতেন এবং দিনে ২।৩ ঘণ্টার বেশি ঘুমাইতেন না। রাজ্যের সমস্ত খবর তিনি রাখিতেন। রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধবিদ্যায় তিনি অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন এবং বহু যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন।

ঔরংজীব

ভারতবর্ষ
মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সীমা
ঔরংজেবের সীমা
বালখ
কাবুল
পেশোয়ার
গজনি
শ্রীনগর
তিব্বত
লাহোর
অমৃতসর
শতদ্রু নদী
কান্দাহার
মুলতান
পাণিপথ
দিল্লী
মালা
সিন্ধু নদ
মা রু বা ড়
আগ্রা
আজমীঢ়
কনৌজ
অমরকোট
হলদিঘাট
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
বারাণসী
পাটনা
চিতোর
আহম্মদাবাদ
মা ল ব
নর্মদা নদী
উজ্জয়িনী
রাজমহল
গৌড়
ঢাকা
চট্টগ্রাম
চন্দননগর
কলিকাতা
ব্রহ্মপুত্র নদ
খান্দেশ
গ গো য়া না
দিউ
সুরাট
বেরার
কটক
ঔরঙ্গাবাদ
আহম্মদনগর
বোম্বাই
রায়গড়
সাতারা
বিজাপুর
কৃষ্ণা নদী
মুসলিপত্তম
বেলারি
গোয়া
তালিকোট
ভেলোর
মাদ্রাজ
জিঞ্জি
কালিকট
কোচিন
তাঞ্জোর
মাদুরা
সিংহল
ভা র ত ম হা সা গ র
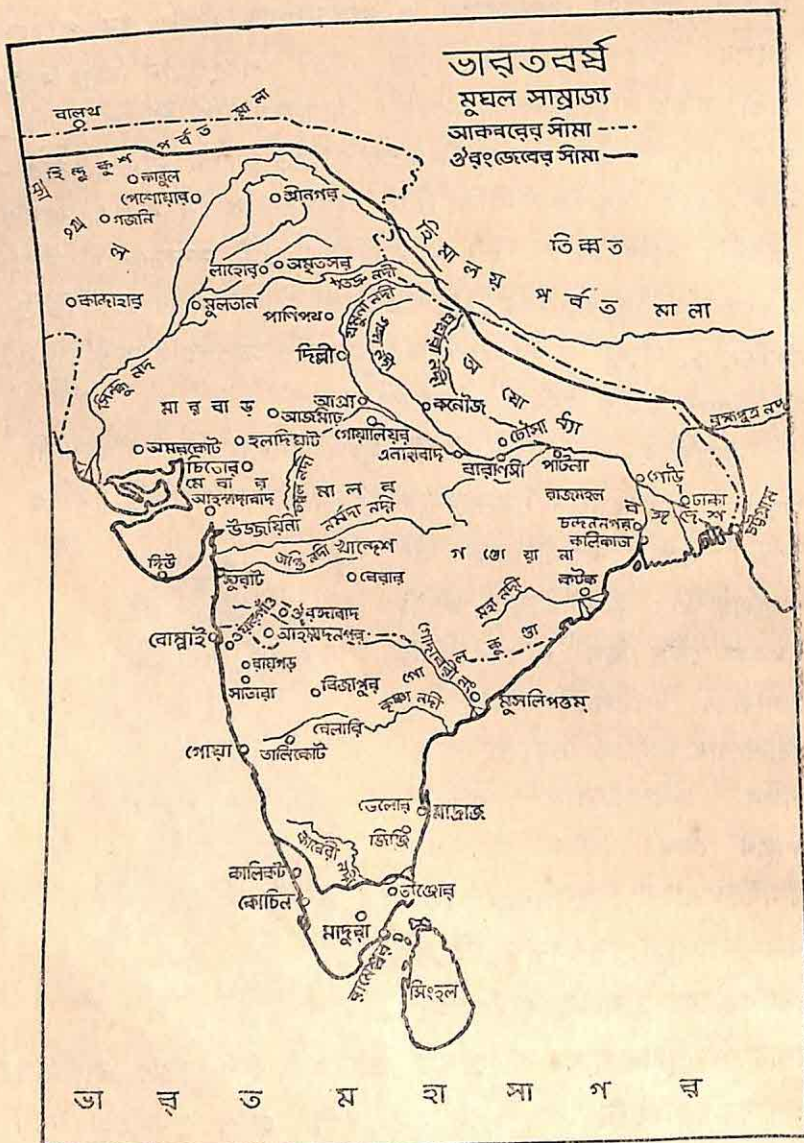
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অতি অনাড়ম্বর ; তাঁহার বেশভূষা ও আহার ছিল অতি সাধারণ। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি বিলাসে দিন কাটাইতেন না। তিনি বলিতেন, রাজাদের আলস্যে ও বিলাসে দিন যাপন করিবার অধিকার নাই। যে রাজা তাহা করেন তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়। তিনি জীবনে মদ্য স্পর্শ করেন নাই। ফকিরের মতই তিনি জীবনযাপন করিতেন। রাজকার্যের ফাঁকে যখনই সময় পাইতেন তখনই টুপী সেলাই করিতেন অথবা কোরাণ নকল করিতেন। ইহা হইতে যাহা আয় হইত তাহা দ্বারা তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইতেন। এত গুণ থাকিলেও তাঁহার কতকগুলি বড় দোষ ছিল। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন ; অন্য ধর্মের লোকদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছেন এবং এজন্য সাম্রাজ্যের স্বার্থ বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। রাজনীতি পরিচালনায় সত্য, সরলতা ও নীতির কোন প্রয়োজন আছে ইহা তিনি মানিতেন না। প্রয়োজন হইলেই তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ এবং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, এমন কি নিজের পুত্রদেরও তিনি সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখিতেন। এজন্য তিনি কখনও কর্মচারী বা প্রজাদের প্রীতি ও আন্তরিক আনুগত্যলাভ করেন নাই।

**মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণ।** ঔরংজীবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য শক্তি ও খ্যাতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল ; আবার তাঁহারই রাজত্বের শেষ ভাগে ইহার দ্রুত পতন হইতে আরম্ভ হইল এবং তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আকবর সাম্রাজ্য শাসনে অতি উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন বিভেদ করেন নাই। হিন্দুদের

উপর হইতে তিনি জিজিয়া ও তীর্থকর তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, হিন্দুদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া, তাহাদের সমর্থন ও সাহায্যে রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন, সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন। ঔরংজীব আকবরের এই উদারনীতি অনুসরণ করেন নাই। তিনি মনে করিতেন ভারতবর্ষ মুসলমানের রাজ্য, এখানে মুসলমান ছাড়া আর কেহই সুবিধা পাইবে না। এজন্য তিনি হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দুদের উপর আবার জিজিয়া কর বসান হইল, তাহাদের ধর্মোৎসব বন্ধ করা হইল, শত শত দেবমন্দির সম্রাটের আদেশে ধ্বংস হইল। জোর করিয়া তিনি হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার এই পরধর্মদ্বেষ সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। একে একে জাঠ, শিখ, রাজপুত ও মারাঠারা বিদ্রোহী হইল। হিন্দুদের মধ্যে নবজাগরণ দেখা দিল এবং বিদ্রোহের আগুনে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল।

ঔরংজীবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য বাহির হইতে খুব বড় ও শক্তিশালী মনে হইলেও ভিতরে ভিতরে ইহা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল সৈন্যবাহিনীতে লক্ষ লক্ষ সৈন্য থাকিত। কিন্তু সৈনিক ও সেনাপতিরা ছিলেন বিলাসী ও দুর্নীতিপরায়ণ। এক একটি মুঘল শিবির ছিল বিরাট শহর। শিবিরের সঙ্গে সৈনিক ছাড়াও হাজার হাজার লোক ও বড় বড় বাজার থাকিত এবং বাজারে বিলাসের দ্রব্য থাকিত প্রচুর। শিবিরের মধ্যেই কত রকম উৎসব চলিত। সৈনিকরা আরাম ও বিলাসে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে যুদ্ধকালে আঘাত হানিবার ক্ষমতা এবং উদ্যমশীলতা মুঘল সৈন্যদের অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। আবার এত বড় শিবির হওয়ায় সৈন্যবাহিনীর দ্রুতগামিতাও ক্ষুণ্ণ

হইয়াছিল। মুঘল বাহিনীর এরূপ তুর্বলতা মুঘলশক্তি পতনের একটি বড় কারণ।

মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের আরও কারণ ছিল। দূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে যাতায়াতের বা সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা ভাল ছিল না। এজন্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্র দিল্লী হইতে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হইত না। সম্রাটদের তুর্বলতা দেখিলেই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল বিদ্রোহ দমন করা সব সময় সম্ভব হইত না। ঔরংজীবের পরবর্তী সম্রাটরা ছিলেন তুর্বল ও অকর্মণ্য। সিংহাসনের অধিকার লইয়া রাজবংশের সন্তানদের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিত। ইহাতে সাম্রাজ্য আরও তুর্বল হইয়া গেল। এরূপে অন্তর্দ্বন্দ্বে মুঘল সাম্রাজ্য যখন ক্রমেই তুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল তখন পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ মুহম্মদ শাহকে পরাজিত করিয়া নাদির দিল্লী অধিকার করিলেন। পারসিক বাহিনী যখন দিল্লী অধিকার করিয়া

নাদির শাহ

রহিয়াছে এমন সময় গুজব রটিল নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে। দিল্লীর অধিবাসীরা তখন কয়েক জন পারসিক সৈন্যকে হত্যা করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির তাঁহার সৈন্যদের আদেশ দিলেন দিল্লীর

অধিবাসীদের হত্যা করিতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষাধিক লোক নির্মমভাবে নিহত হইল। মুহম্মদ শাহ অনেক অনুনয় করিয়া নাদিরকে শান্ত করিলেন; তখন হত্যাকাণ্ড বন্ধ হইল। ইহার পর নাদির কোটি কোটি টাকার মণিমাণিক্য, কয়েক কোটি নগদ টাকা, ময়ূর সিংহাসন এবং প্রসিদ্ধ কোহিনুর হীরক লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। মুঘল সম্রাটদের গৌরব রবি ইহার পর প্রকৃতপক্ষে অস্তমিত হইল। ইহার পর আফগানিস্তানের অধিপতি আহমদ শাহ দুইবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

**শাসনব্যবস্থা।** আকবর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র শাসনের চরম কর্তৃত্ব ছিল সম্রাটের হাতে। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী থাকিতেন। তাঁহারা সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে নিজ নিজ বিভাগের শাসন পরিচালনা করিতেন।

**বর্তমান যুগের শাসনব্যবস্থা ও মুঘল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈষম্য।** মুঘল শাসনব্যবস্থা মূলতঃ একনায়কতন্ত্রী হইলেও ইহার কতগুলি বৈশিষ্ট্য বর্তমান যুগের শাসনব্যবস্থার মধ্যেও দেখা যায়। বর্তমান কালের ন্যায় মুঘলসাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত ছিল। সুবাগুলি আবার কতকগুলি সরকারে এবং প্রতি সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সরকার ও পরগণাগুলিকে যথাক্রমে জেলা ও মহকুমার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া সুবাদার বা সিপাহ্‌শলার শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ইঁহাদের স্থান কতকটা বর্তমান কালের গভর্ণদের ন্যায়। গণতান্ত্রিক শাসনে গভর্ণরদের ক্ষমতা খুব সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। কিন্তু মুঘলযুগে সুবাদারদের বিস্তৃত ক্ষমতা ছিল। প্রদেশে তাঁহারা শাসন, বিচার ও সৈন্য বিভাগের কর্তা ছিলেন। সুবাদারদের অধীনে

অনেক বড় বড় রাজকর্মচারী থাকিতেন, যথা,—দেওয়ান, ফৌজদার, কোতোয়াল, কাজী ইত্যাদি। প্রদেশের রাজস্ব বিভাগের ভার ছিল দেওয়ানের হাতে। ইঁহাদের ক্ষমতা ছিল খুব বেশি। অনেক সময় ইঁহারা সুবাদারদের সমকক্ষ কর্মচারীর ন্যায় কার্য করিতেন। সুবাদার ও দেওয়ান সর্বদা পরস্পরের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন যাহাতে কাহারও প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি না পায়। ইহাতে বিদ্রোহের আশঙ্কা নিবারিত হইত। সুবাদার ও দেওয়ানের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাহার মীমাংসা করিতেন।

সরকার বা জেলার শাসনভার ফৌজদারদের হাতে ন্যস্ত ছিল। সুবাদারদের অধীনে ইঁহারা ছিলেন সামরিক কর্মচারী। নিজ নিজ এলাকার শান্তিরক্ষা ও শাসন পরিচালনার জন্য ইঁহারা সুবাদারের নিকট দায়ী থাকিতেন। ইঁহাদের কাজ অনেকটা বর্তমান কালের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ন্যায়। শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কোতোয়াল নামধারী কর্মচারীদের হাতে ছিল। বর্তমান কালে পুলিশ বিভাগের দারোগা ও বিভিন্ন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটরা যে কার্য করেন কোতোয়ালরা অনুরূপ কার্য করিতেন। অপরাধ নিবারণ, চোর ও ডাকাত প্রভৃতি ধরা, ছোটখাট অপরাধের বিচার প্রভৃতি কয়েক প্রকার কার্য তাঁহাদের করিতে হইত। উত্তর ভারতে থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীদের এখনও কোতোয়াল বলা হয় এবং থানাগুলি অনেক স্থানে কোতোয়ালী নামে পরিচিত। কাজী ও মীর আদল্ নামধারী কর্মচারীরা বিচার বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন।

দেওয়ানদের অধীনে সুবা, সরকার ও পরগণা হইতে রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত বহু কর্মচারী ছিল। কোথাও রাজস্ব আদায়ের অসুবিধা দেখা দিলে ইঁহারা ফৌজদারদের সাহায্য লইতেন।

আকবরের রাজস্ব বিভাগের সুব্যবস্থা করেন রাজা টোডরমল। তিনি রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া উর্বরতা অনুযায়ী উহাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। তাহার পর প্রত্যেক শ্রেণীর জমিগুলির রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর বলিয়া গ্রহণ করা হইত। প্রজারা অর্থ বা শস্য দ্বারা রাজকর দিতে পারিত। রাজকর্মচারীরা প্রজার উপর অযথা অত্যাচার করিলে কঠোর শাস্তি পাইতেন। ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে আকবর যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাই ইংরাজ সরকার মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেকালের গ্রামগুলি ছিল অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ং-শাসিত। গ্রামের বিবাদবিসম্বাদ গ্রাম-পঞ্চায়েৎ মীমাংসা করিতেন। প্রত্যেক গ্রামে একজন গ্রামপ্রধান বা মূকদ্দম থাকিতেন। তিনি গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন এবং রাজস্ব আদায়ে রাজকর্মচারীদের সাহায্য করিতেন।

মুঘল যুগের শাসন-নীতির সহিত বর্তমান যুগের শাসন-নীতির একটি বড় পার্থক্য আছে। সে যুগে রাজা-বাদশাহেরা ছিলেন স্বৈরাচারী। রাষ্ট্রের তুইটি দায়িত্ব ছিল—দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখিয়া মানুষের জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদ রাখা। ইহার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে পুলিশ ও আইন-আদালত এবং সৈন্যবাহিনী থাকিত। রাজা বা রাষ্ট্রের পক্ষে ইহার অধিক কিছু করণীয় নাই, ইহাই ছিল সেযুগের শাসন-নীতির মূল সূত্র। কিন্তু বর্তমান কালে রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্বের পরিসর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিরাক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও উন্নতি

সাধন রাষ্ট্রের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং খাদ্য ও কর্মের সংস্থান ইত্যাদি বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কার্য এখন রাষ্ট্রকে করিতে হয়। মুঘলযুগে এসব কর্তব্যের কথা কাহারও মনে আসিত না। তবে রাজা ভাল হইলে প্রজার যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

আকবর সৈন্যবিভাগের সংস্কার করেন। রাজকর্মচারীদের প্রয়োজন মত সম্রাটকে সৈন্য সাহায্য দিতে হইত। এজন্য রাজ-কর্মচারীরা জায়গীর ভোগ করিতেন। তাঁহারা জায়গীরের আয় ভোগ করিতেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সৈন্যবল রাখিতেন না। ইহাতে রাজস্বের ক্ষতি হইত, আবার রাষ্ট্রের সামরিক বল ক্ষুণ্ণ হইত। আকবর এজন্য জায়গীর প্রথা তুলিয়া দিয়া মনসব প্রথার প্রবর্তন করিলেন। প্রত্যেক মনসবদার রাজকোষ হইতে নির্দিষ্ট হারে বেতন পাইতেন। রাজকর্মচারীদের প্রত্যেককে মনসব দেওয়া হইল এবং মনসবদারদের ৩৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। শ্রেণী অনুসারে মনসবদাররা দশ হইতে পাঁচ হাজার পর্যন্ত সৈন্যের অধিনায়ক হইতেন। আরও বড় মনসবগুলি রাজকুমারদের দেওয়া হইত। প্রত্যেক মনসবদার নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য বাদশাহকে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিতেন।

মুঘলযুগে মুহ্‌তাসিব নামে আর এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিলেন। ইঁহারা প্রজাদের প্রাণ ও ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন এবং সকলে কোরাণ ও সরিয়তের নির্দেশ পালন করিতেছে কিনা দেখিতেন। নাগরিকদের মধ্যে দুর্নীতি নিবারণের দায়িত্বও ইঁহাদের ছিল।

**মুঘল সংস্কৃতি।** মুসলমান শাসনের প্রথম যুগে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই জাতির মধ্যে বিরোধের ভাব খুব বেশি ছিল। তারপর পরস্পর বহুকাল পাশাপাশি একত্র বাস করিবার ফলে ধীরে ধীরে উভয় জাতির মধ্যে সমন্বয় ঘটিতে লাগিল। মুঘল যুগে আকবরের উদার নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মিলনসূত্র রচিত হইয়াছিল তাহার প্রভাব জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা গেল। এযুগের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পে এই সমন্বয় প্রতিফলিত হইয়াছে। মুঘল সংস্কৃতি ও শিল্পরীতির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান রীতির সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।

আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্ জহানের আমলে চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে এবং এই সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পীরা যে মনীষা ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছে তাহা অতি বিস্ময়কর। এযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে যে রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা 'ইন্দো-পারসিক' রীতি নামে পরিচিত। আকবরের শাসনকালে নির্মিত হুমায়ুনের সমাধি ভবন, আগ্রার নিকট ফতেপুর সিক্রীর সুরম্য প্রাসাদাবলী, শাহ্ জহানের নির্মিত তাজমহল, আগ্রার দুর্গ ও প্রাসাদ ভবন, দিল্লীর লালকেল্লা নামক প্রাসাদ ভবন এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ দরবার গৃহসমূহ এবং জাম-ই-মসজিদ, বিশ্ববিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন এবং সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি-মন্দির মুঘলস্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ
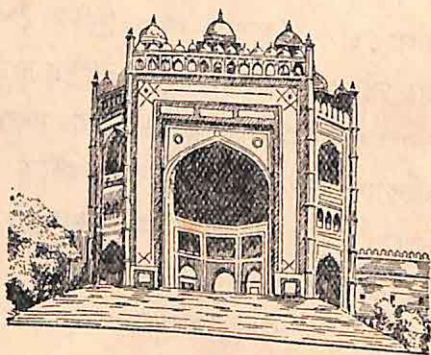
বুলান্দ দরওয়াজা ( ফতেপুর সিক্রী ).

সেকেন্দ্রা

তাজমহল

জুম্মা মসজিদ ( দিল্লী )

দিল্লীর লালকেল্লা
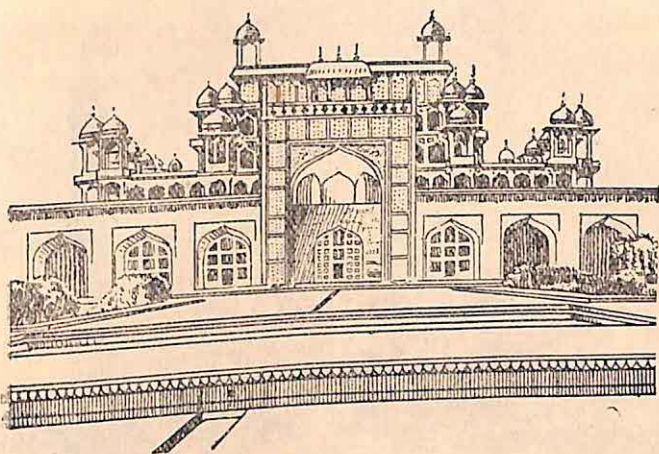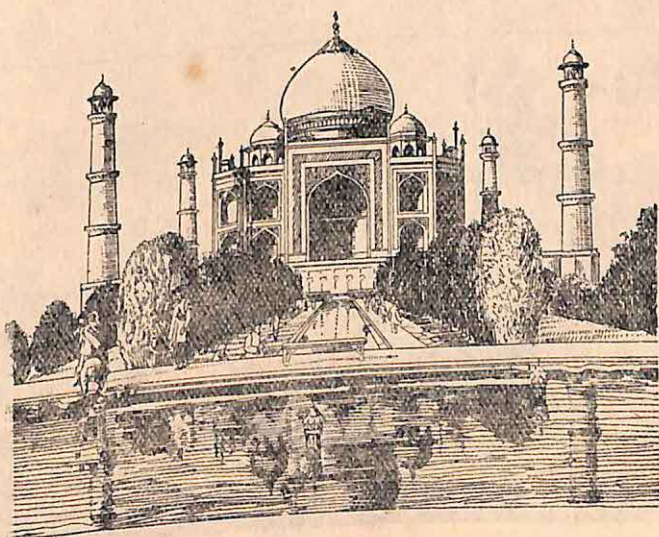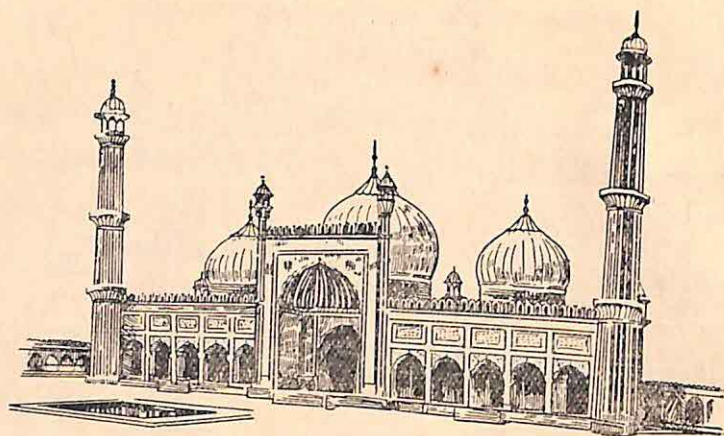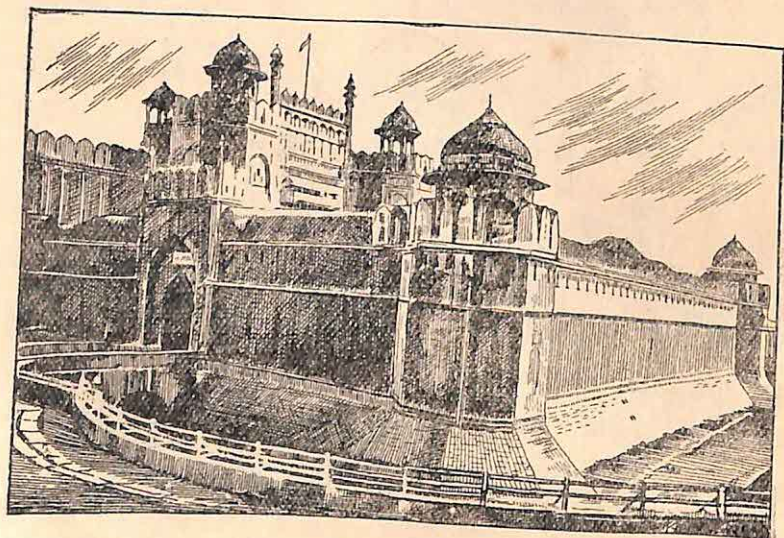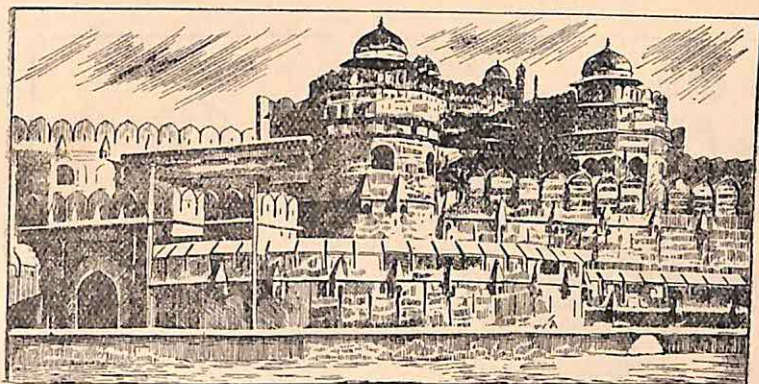
আগ্রার দুর্গ
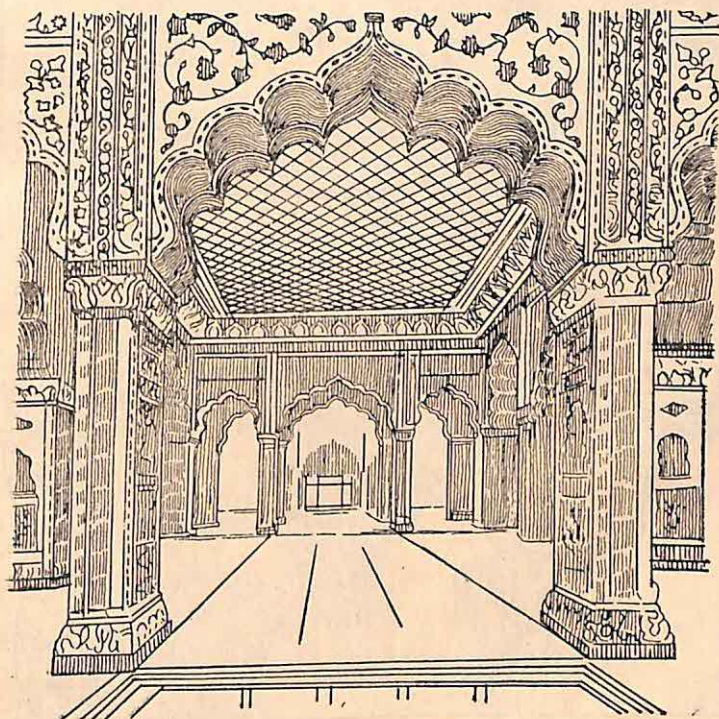
দেওয়ান-ই-খাস ( দিল্লী )
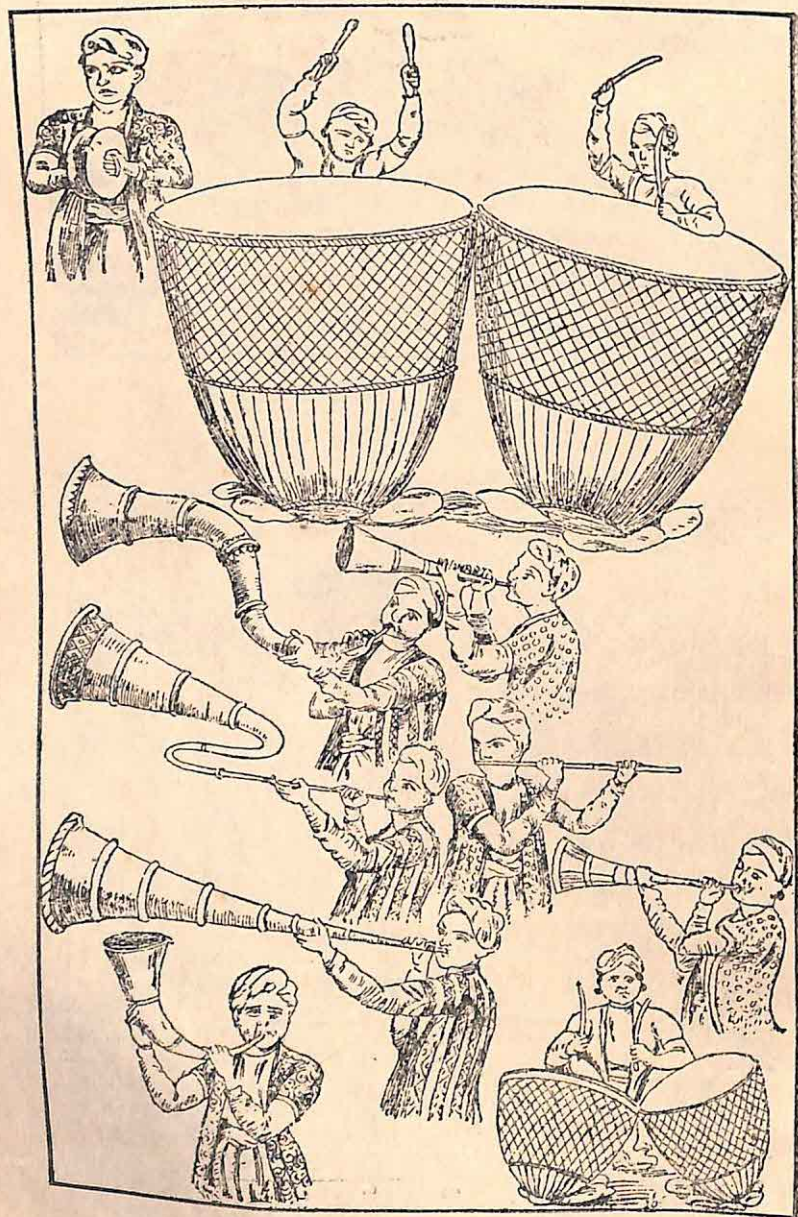
মুঘলযুগের বাদ্যযন্ত্র
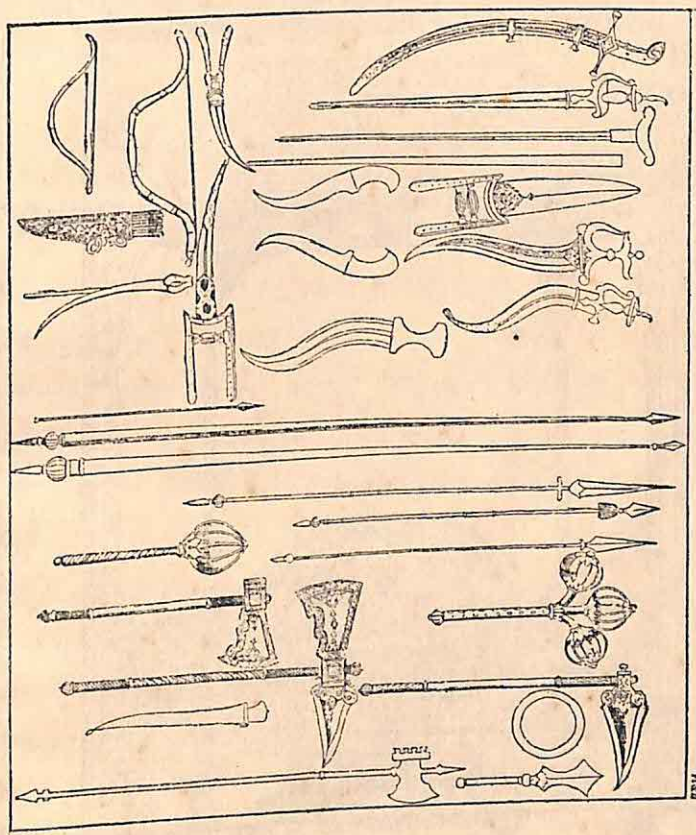
মুঘলযুগের অস্ত্রশস্ত্র
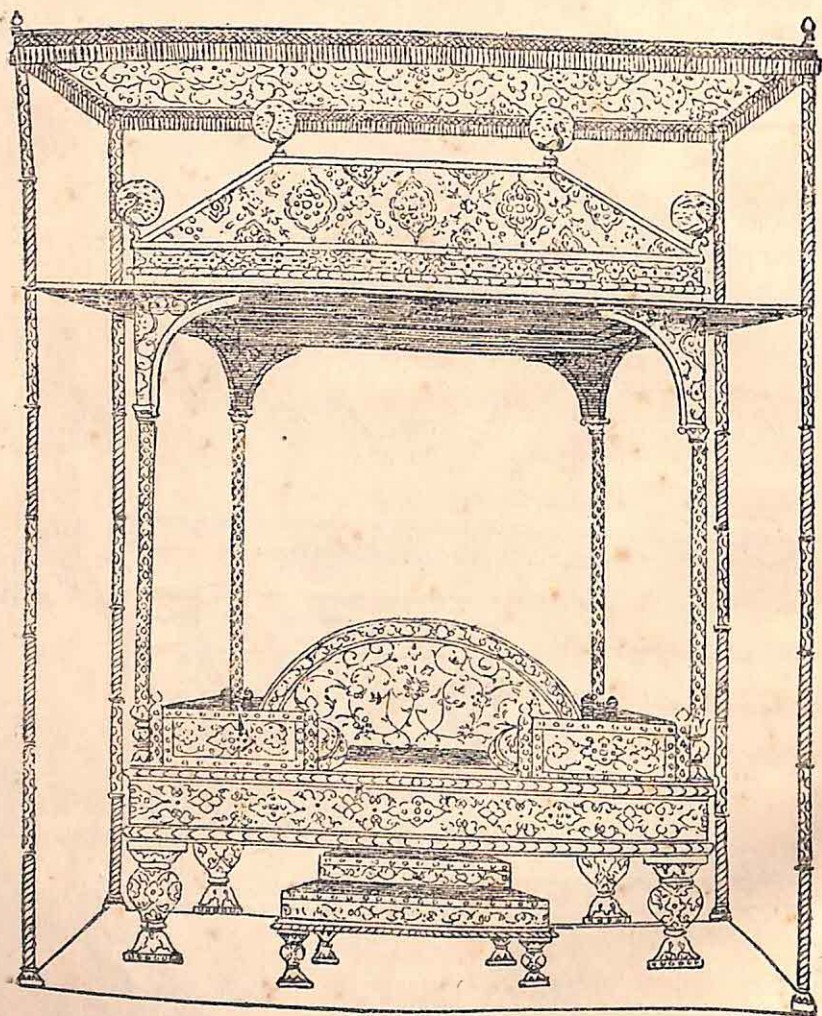
মুঘল যুগের একখানি সিংহাসন

নিদর্শন। মর্মরপ্রস্তর ও মণিমুক্তাদি মূল্যবান প্রস্তর রচিত এই সকল হর্ম্যমালার অনুপম সৌন্দর্য ও বিচিত্র কারুকার্য দেখিলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। এযুগের সমাজিক রীতি-নীতি, ধর্মানুষ্ঠান ও সাহিত্যের মধ্যেও হিন্দুমুসলমান ভাবধারার সমন্বয় দেখা যায়। বহু হিন্দু ও মুসলমান মনীষী হিন্দী, উর্দূ ও পারসিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া এযুগের সাহিত্যসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

**বিদেশী বণিকদের আগমন।** মুঘলযুগে কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা মুঘল আমলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়াছিলেন ভারতের সহিত নিজ নিজ দেশের ব্যবসাবানিজ্য স্থাপন করিতে। ইউরোপীয় বণিকদিগের আগমন এবং ভারতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন এ যুগের ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা। ইংরাজ বণিকদের আগমন ও ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপনের সূচনা এই সময় হয়। ক্যাপটেন হকিনস্ নামে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সুরাটে প্রথম ইংরাজ-বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয়। সার টমাস রো নামে একব্যক্তি ইংলণ্ড-রাজ প্রথম জেম্‌সের রাজদূত রূপে

স্যার টমাস রো

জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায় চারি বৎসর ভারতে ছিলেন। রো সম্রাটের নিকট হইতে সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ ও বরোচ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিবার অনুমতি লাভ করেন। শাহজহান ও ঔরংজীবের রাজত্বকালে

ওলন্দাজ, ডেন, ফরাসী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলি ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল।
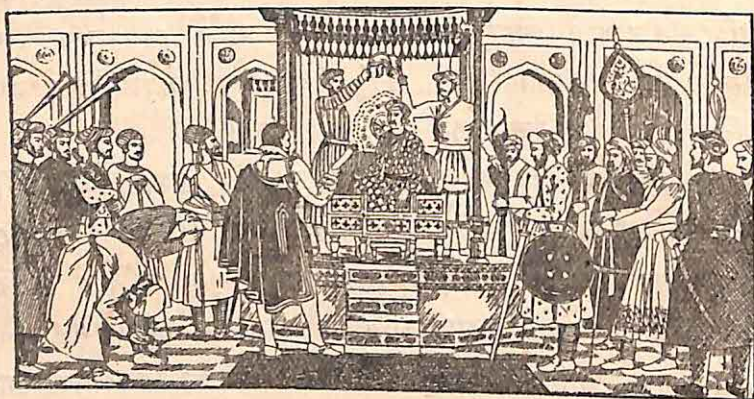
টমাস রোয়ের দৌত্য

**মুঘলযুগের জীবন-ধারা।** সেকালে রাজা-বাদশাহদের এবং আমীরওমরাহদের জীবনকাহিনী লইয়াই ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণ লোকের কথা, তাহাদের সুখদুঃখ, কাজকর্ম, জীবনযাত্রার কথা ভালভাবে জানিবার উপায় নাই। তথাপি এ সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর আমরা জানিতে পারি সে যুগের লোকসাহিত্য এবং ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে। আবার তখনকার সমসাময়িক বাণিজ্য কুঠিগুলির কাগজপত্র হইতেও দেশের বৈষয়িক ও রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। রাজাদের কথা, তাঁহাদের দরবারের জাঁকজমক ও আড়ম্বর এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের অনেক কথাই আমরা জানিতে পারি সেযুগের ইতিহাস লেখকদের গ্রন্থ হইতে এবং বাদশাহদের স্বরচিত আত্মজীবনী হইতে। বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, গুলবদন বেগম লিখিত হুমায়ুন নামা এবং

আবুলফজলের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ আইন-ই-আকবরী অতি মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ।

মুঘল যুগে সম্রাট ও তাঁহার আমীরওমরাহ এবং রাজা মহারাজদের ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। অপরিমিত বিলাসে তাঁহারা জীবনযাপন করিতেন। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার্য দ্রব্য এবং উৎসব প্রভৃতিতে ইঁহারা অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। বাদশাহদের রাজকোষ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যে পূর্ণ ছিল। ফরাসী ব্যবসায়ী তা ভার্নিয়ে শাহ্‌জহান ও ঔরংজীবের ঐশ্বর্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করিয়াছেন।

সার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। সম্রাট দিনে তিনবার দরবার করিতেন। হকিনস্ বলিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীর খুব মদ্যপান করিতেন এবং এজন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। বাদশাহদের জন্মদিনে খুব বড় উৎসব হইত। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য দিয়া তাঁহাদের ওজন করিয়া এই সকল দ্রব্য প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করা হইত। আকবরের জন্য বৎসরে একহাজার মূল্যবান পোষাক তৈয়ারি হইত। এ সবই তিনি বিশিষ্ট অতিথিদের উপহার দিতেন। ফরাসী চিকিৎসক বের্ণিয়ে বার বৎসর এদেশে ছিলেন। শাহ্‌জহান ও ঔরংজীবের ঐশ্বর্য দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছিলেন। আমীরওমরাহেরা জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব বাদশাহদের অনুকরণ করিতেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা দুঃখদুর্দশায় দিন কাটাইত। ছোট ছোট খড়ের ঘরে তাহারা বাস করিত। পোষাকপরিচ্ছদ বলিতে তাহাদের প্রায় কিছুই ছিলনা। রাজকর্মচারীরা অনেক সময়ে বিনা বেতনে অথবা অর্ধ বেতনে শ্রমিকদের খাটাইতেন। কৃষকদের উপরেও রাজকর্মচারীরা অনেক সময় উৎপীড়ন করিতেন।

সাধারণ লোকের আয় খুব কম হিল ; কিন্তু জিনিষপত্রের মূল্য খুব সস্তা থাকায় নিতান্ত দরিদ্র লোকও দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। সেযুগে সাধারণ লোকের অবস্থা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এরূপ ছিল।

মুঘলযুগে ভারতের সহিত এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশের বাণিজ্য চলিত এবং বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে ভারতের প্রভূত লাভ হইত। লাহোর, আহমদাবাদ প্রভৃতি নগরগুলি খুব বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলি তখন খুব সম্পদশালী ছিল।

ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা ভাল ছিল। রাজকর্মচারীরা অনেক সময় উৎপীড়ন করিয়া বণিকদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন। বণিকরা এজন্য আয় গোপন রাখিয়া দরিদ্রের মত বাস করিত। সাধারণ দোকানদারদের অবস্থা প্রায় শ্রমিকদের মত ছিল। আমীর-ওমরাহেরা অনেক সময় বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে জিনিষ লইয়া যাইতেন।

মুঘল যুগে অনেক বড় বড় জনবহুল নগর ছিল। আয়তনে ও জন সংখ্যায় আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রী লণ্ডন হইতেও বড় ছিল। লাহোর, আহমদাবাদ, বুরহানপুর ও ঢাকা বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা বাংলা দেশের ধনসম্পদ, ইহার শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র, জনাকীর্ণ গ্রাম ও নগর এবং ইহার নানাবিধ শিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী বিভিন্ন বন্দরে দেশবিদেশের বণিকরা পণ্য লইয়া আসিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতবর্ষ তখন পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠতম দেশ ছিল।

## কালপঞ্জী

**রাজত্বকাল**

বাবর—১৫২৬—৩০

হুমায়ুন—১৫৩০—৪০, ১৫৫৫—৫৬

আকবর—১৫৫৬—১৬০৫

জাহাঙ্গীর—১৬০৫—১৬২৭

শাহ্ জহান—১৬২৭—:৬৫৮

ঔরংজীব—১৬৫৮—১৭০৭

২য় বাহাদুর শাহ ( শেষ মুঘল সম্রাট )—১৮৩৭—১৮৫৮

পাণিপথের যুদ্ধ ১ম—১৫২৬

" " ২য়—১৫৫৬

---

# ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-বিপ্লব

**যুগ পরিবর্তন।** পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত মোট একশত আঠার বৎসর কাল টিউডর রাজবংশ ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন। টিউডর যুগ ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। এই যুগে ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশের ন্যায় ইংলণ্ডেও গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। রেনেসাঁস, ধর্মসংস্কার, ভৌগোলিক আবিষ্কার ও বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি যুগান্তকারী আন্দোলন ইংরাজ জাতির জীবনকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং ইংলণ্ড ধীরে ধীরে মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া নবযুগে পদার্পণ করে। নবযুগের আগমনের ফলে ইংরাজ জাতির রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এতকাল ইংলণ্ডের সমাজ ছিল ফিউডালতান্ত্রিক। সমাজে ও রাষ্ট্রে রাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন সকল শক্তি ও সুখসুবিধার অধিকারী। কিন্তু টিউডর যুগে জ্ঞানের প্রসার, বাণিজ্য বিস্তার ও নাগরিক জীবন বিকাশের ফলে দেশে প্রভাবশালী দৃঢ় চরিত্র এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের নিমিত্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিল। ফলে রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ বাধিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে, ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের শাসনকালে প্রজাশক্তি রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়া শাসন নিয়ন্ত্রণের সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করিল। ইহা ইতিহাসে ইংলণ্ডের রাষ্ট্র বিপ্লব নামে খ্যাত।

**টিউডর যুগে ইংলণ্ডের প্রগতি।** টিউডর রাজারা ইংলণ্ডে একটি শক্তিশালী ও সবল রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকায় ইংলণ্ডের জনসাধারণ রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন প্রভৃতি এ যুগের যুগান্তকারী আন্দোলনগুলিতে সাগ্রহে যোগ দিবার অবসর পাইল এবং তাহারই ফলে ইংলণ্ডে নবযুগের সূচনা হইল। রাজারা বিশেষ করিয়া রাণী এলিজাবেথ ছিলেন বিজ্ঞ, জনপ্রিয় এবং জাতির আশা, আকাঙ্খা এবং সাংস্কৃতিক ও আবিষ্কার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। সুতরাং রাজায় প্রজায় কোন গুরুতর মতভেদ তখন দেখা দেয় নাই।

রাণী এলিজাবেথ

**ষ্টুয়ার্টযুগ—রাজায় প্রজায় বিরোধ।** টিউডরদের পরে ষ্টুয়ার্ট বংশ ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন বিদেশী। ইংরাজ জাতির ইতিহাসের গতি ও মনোভাবের সহিত তাঁহারা মোটেই পরিচিত ছিলেন না। টিউডর যুগের শেষভাগে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে, ইংরাজ জাতির মনোভাবে যে এক বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে, জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহারা ছিলেন সর্বপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধী। টিউডর যুগের স্বৈরাচারী রাজাদের ন্যায় তাঁহারা রাজ্যশাসন করিতে চাহিলেন। জাতীয় পরিষদ বা পার্লামেন্ট ইহাতে বাধা দিল। সুতরাং রাজশক্তি

ও প্রজাশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠিল। অনেকগুলি প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া এই দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

**বিরোধের কারণ।** রাজপদ সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট রাজাদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তাহারা মনে করিতেন, রাজা ভগবানের প্রতিনিধি; রাষ্ট্রশাসনের চরম অধিকার রাজার, প্রজার নয়। রাজা তাঁহার কার্যের জন্য একমাত্র ভগবানের নিকট দায়ী। শাসননীতি অথবা রাজার কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার প্রজার নাই। ভগবানের প্রতিনিধি রাজার সকল আদেশ মানিয়া চলা প্রজার একান্ত কর্তব্য। এই মতবাদ 'দৈবস্বত্ব' নামে খ্যাত। ইহা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজা প্রথম জেম্‌স প্রজাদের জানাইলেন যে, রাষ্ট্র শাসনের চরম অধিকার রাজার এবং তাঁহার আদেশ মানিয়া লওয়া প্রজাদের কর্তব্য। তখন পার্লামেণ্ট রাজাকে জানাইয়া দিল যে, তাঁহার এ ধারণা ভুল; ইংলণ্ডের প্রাচীন রীতি অনুসারে রাজা পার্লামেণ্টের সহযোগে রাজকার্য পরিচালনা করিবেন। ইংলণ্ডের একটি প্রাচীন আইন ছিল যে, পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়া রাজা আইন প্রণয়ন ও প্রজার উপর কর স্থাপন করিতে পারিবেন না। জেম্‌স ইহা মানিতে চাহিলেন না। তিনি প্রজাদের নিকট হইতে জোর

১ম জেমস্

করিয়া কর আদায় করিতেন এবং অবাধ্য প্রজাদের ইচ্ছামত বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিতেন। পার্লামেণ্ট দেখিল, রাজার এ অধিকার যদি থাকে তাহা হইলে রাজার স্বেচ্ছাচার কখনও নিবারণ করা যাইবে না এবং ইহার ফলে প্রজার স্বাধীনতাও লোপ পাইবে। পার্লামেণ্ট তখন সুস্পষ্ট দাবি জানাইল যে, ইহার সম্মতি ব্যতীত রাজা প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ অথবা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না এবং বিনা বিচারে কাহাকেও কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন না। ইহা ছাড়া ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াও রাজার সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধ দেখা দিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ধর্ম বিষয়ে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল,—রোমান ক্যাথলিক, পিউরিটান এবং চার্চ-অব ইংলণ্ড বা এলিজাবেথ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় চার্চের অনুসরণকারী। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য ছিলেন পিউরিটান মতাবলম্বী। জেম্‌স জাতীয় চার্চের নীতি অনুমোদন করিতেন। এজন্য পিউরিটানরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল। তাঁহার পুত্র প্রথম চার্লস ক্যাথলিকদের প্রতি রীতিমত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং নিজের ধর্মমত ও নীতি প্রজার উপর জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করেন। পার্লামেণ্ট রাজাকে জানাইয়া দিল যে, জোর করিয়া প্রজার উপর ধর্মমত চাপান যাইবে না। এই মূল প্রশ্নগুলি লইয়া বিরোধ চরমে উঠিল।

রাজা ও পার্লামেণ্ট। জেম্‌স্ ও তাঁহার পুত্র প্রথম চার্লস্ তাঁহাদের রাজত্বকালে কয়েকবার পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতি বারই রাজা ও প্রজার মধ্যে শাসননীতি ও অন্যান্য বিষয় লইয়া মতবিরোধ ঘটিল। জেম্‌স ক্রুদ্ধ হইয়া বার বার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং পার্লামেণ্টকে উপেক্ষা করিয়া প্রজার নিকট হইতে ইচ্ছামত কর আদায় করিয়া এবং অবাধ্য প্রজাকে শাস্তি দিয়া শাসন করিতে লাগিলেন।

ক্রমওয়েলই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্বেসর্বা হইলেন এবং নিজের খুশী মত শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনের ফলে ইংলণ্ডে শান্তি আসিল এবং সর্বত্র ইংলণ্ডের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু ক্রমওয়েলের স্বেচ্ছাচারী শাসনে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর পার্লামেণ্ট রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিল। ১ম চার্লসের পুত্র ২য় চার্লস রাজা হইলেন। রাজা হইয়া তিনি পার্লামেণ্টের সহিত সাবধানে বিরোধ এড়াইয়া চলিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল মোটামুটি শান্তিতেই কাটিয়াছিল।

২য় চার্লস

**মহাবিপ্লব।** ২য় চার্লসের মৃত্যুর পর রাজা হইলেন তাঁহার ভ্রাতা ২য় জেম্‌স। তিনি ছিলেন একগুঁয়ে ও নির্বোধ এবং শাসন পরিচালনায় রাজার অবাধ ক্ষমতায় বিশ্বাসী। ইহার উপর আবার তিনি গোঁড়া রোম্যান ক্যাথলিক ছিলেন। রাজা হইয়াই তিনি অবাধ রাজশক্তি ও ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃস্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। সুতরাং নূতন করিয়া রাজার সহিত পার্লামেণ্টের বিরোধ আরম্ভ হইল। জেম্‌স অত্যাচার করিয়া এবং ভয়

২য় জেমস

দেখাইয়া প্রজাদের স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিলেন। প্রজারা দেখিল রাজার লক্ষ্য সফলতা লাভ করিলে তাহাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ধর্মমতের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে। তখন রাজ্যের সমস্ত শ্রেণীর প্রজারা রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল এবং জেমসের জামাতা হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ ও তাঁহার পত্নী মেরীকে ইংলণ্ডের সিংহাসন গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। উইলিয়ম অবিলম্বে সসৈন্যে ইংলণ্ডে আসিলেন। জেমস্ কাহারও নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্য না পাইয়া পলায়ন করিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় লইলেন।
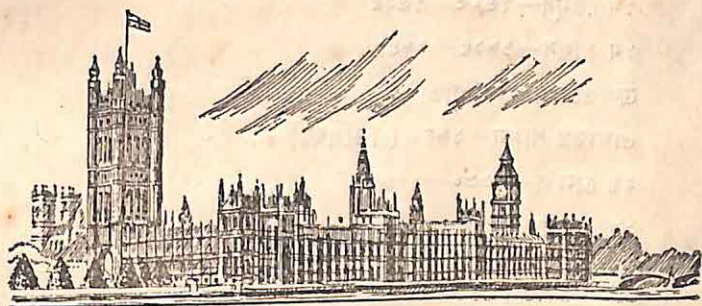
পার্লামেণ্ট ভবন

ফলাফল। জেমসের পলায়ন ও উইলিয়মের সিংহাসন অধিকার ইতিহাসে 'রক্তহীন মহাবিপ্লব' বা 'গৌরবময় বিপ্লব' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রাজপরিবর্তনে যুদ্ধবিগ্রহ বা রক্তপাত হয় নাই। প্রথম জেমসের রাজত্বকাল হইতে রাষ্ট্রশাসনের অধিকারের প্রশ্ন লইয়া রাজায় প্রজায় যে বিবাদ সুরু হইয়াছিল, তাহার সুমীমাংসা হইল; পার্লামেণ্ট জয়লাভ করিল। বিপ্লবের ফলে এই নীতি স্থাপিত হইল যে, রাজা অত্যাচারী হইলে পার্লামেণ্ট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিবে। রাষ্ট্রশাসনে পার্লামেণ্টের অধিকার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার পর 'বিল অব্ রাইট্স' বা 'অধিকার সংক্রান্ত আইন' নামে একটিবিধি পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল। ইহার দ্বারা রাজা ও প্রজার অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে রাজা ও প্রজার মধ্যে সকল বিরোধের অবসান হইল। এখন হইতে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হইল। রাজারা রাজত্ব করিতেন কিন্তু শাসন-পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে গেল।

## কালপঞ্জী

টিউডর বংশের রাজত্বকাল—১৪৮৫—১৬০৩

ষ্টুয়ার্ট বংশ

১ম জেম্স—১৬০৩—১৬২৫

১ম চার্লস্—১৬২৫—১৬৪৯

ক্রমওয়েলের আধিপত্য—

প্রজাতন্ত্র শাসন—১৬৪৯ (ডিসেম্বর)—১৬৬০

২য় চার্লস—১৬৬০—১৬৮৫

২য় জেম্স্—১৬৮৫—১৬৮৮

পিটিসন অব্ রাইট্—১৬২৮

মহাবিপ্লব—১৬৮৮

---

# ভারতে ইংরাজ অধিকার বিস্তার

**মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও ভারতে বহু স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব।**

মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন ঔরংজীব। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ঔরংজীবের রাজত্বকালেই মারাঠা, শিখ ও রাজপুতরা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দাক্ষিণাত্যে শিবাজী একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করিলেন। ঔরংজীব বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও মারাঠাদের দমন করিতে পারেন নাই। তিনি রাজপুতদের সহিত যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার মৃত্যুকালে শেষ হয় নাই। পঞ্জাবে নবজাগ্রত শিখ শক্তিকেও তিনি দমন করিতে পারেন নাই। মারাঠা, রাজপুত ও শিখদের সহিত সংঘর্ষে সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল।

শিবাজী

গুরু গোবিন্দ সিংহ

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্বল ও অপদার্থ বংশধরদিগের রাজত্বকালে সিংহাসন লইয়া বিভিন্ন দাবিদারদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং ওমরাহদিগের মধ্যে দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সম্রাটদিগের দুর্বলতা এবং

পার্লামেন্টকে এরূপভাবে অগ্রাহ্য করায় ইহা উত্তরোত্তর রাজ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। জেম্‌সের জীবিতকালে রাজায়প্রজায় দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা হইল না। তাঁহারপুত্র প্রথম চার্লস রাজা হইয়া পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। সুতরাং রাজার সহিত প্রজার গোলযোগ বাড়িয়াই চলিল। রাজা হইবার অল্পকাল পরেই পার্লামেন্ট 'পিটিশন অব্ রাইট্' বা 'অধিকারের দলিল' নামে এক আবেদন তাঁহার নিকট পেশ করিল। ইহাতে মোটামুটি রাজাকে জানান হইল যে, তিনি বে-আইনীভাবে কর আদায় করিতে পারিবেন না এবং বিনা বিচারে প্রজাকে কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন না। নিরুপায় হইয়া রাজা এ দাবি স্বীকার করিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণের অধিকারের ইহা একটি বড় দলিল। কিন্তু চার্লস এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেন। ইহার পর প্রায় এগার বৎসর কাল তিনি পার্লামেন্ট ডাকিলেন না, ইচ্ছামত অন্যায় ও অবৈধভাবে প্রজার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া শাসন চালাইতে লাগিলেন এবং প্রজাদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। রাজা না ডাকিলে পার্লামেন্টের অধিবেশন হইতে পারে না, সুতরাং পার্লামেন্টও নিরুপায় হইয়া বসিয়া রহিল।

১ম চার্লস

রাজশক্তির পতন। এগার বৎসর পরে অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া চার্লস্ আবার পার্লামেন্ট আহ্বান করিলেন। এই পার্লামেন্ট 'দীর্ঘ পার্লামেন্ট' নামে খ্যাত। বহুকাল রাজার অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া

প্রজারা প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং অধিবেশন আরম্ভ হইতেই পার্লামেণ্ট আইন করিয়া একে একে রাজার অধিকার কাড়িয়া লইতে লাগিল। রাজা ও তাঁহার দলের লোকেরা ইহাতে বাধা দিল। 'দীর্ঘ পার্লামেণ্ট' আহুত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ছয় বৎসরের মধ্যে চার্লস পরাজিত হইয়া পার্লামেণ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। অত্যাচারী, দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক—এই অপরাধে পার্লামেণ্টের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল ( ১৬৪৯ )।

**অলিভার ক্রমওয়েল—প্রজাতন্ত্র শাসন স্থাপন।** এই গৃহযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে একজন অতি শক্তিশালী সুযোগ্য ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার নাম অলিভার ক্রমওয়েল। তিনি এক ভদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯ বৎসরবয়সে পার্লামেণ্টের সভ্যপদে নির্বাচিত হন। তিনি পিউরিটান মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পার্লামেণ্টের অধিকার রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। গৃহযুদ্ধ কালে তিনি পার্লামেণ্ট পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অসাধারণ সামরিক প্রতিভাবলে রাজপক্ষকে বারবার পরাজিত করয়াছিলেন।

অলিভার ক্রমওয়েল

তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নির্মল ও নিঃস্বার্থ। চার্লসের প্রাণদণ্ডের পরে ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে দশ বৎসর পর্যন্ত গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল। কিন্তু নামে গণতন্ত্র হইলেও

রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে স্বাধীন হইতে লাগিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল মুল্‌ক দাক্ষিণাত্যের শাসনভার লইয়া সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনিই হায়দরাবাদে নিজাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বৎসরেই অযোধ্যা স্বাধীন হইয়া গেল। ইহার ষোল বৎসর পরে (১৭৪০) বাংলার সুবাদার আলিবর্দী খাঁ বাদশাহকে করদান বন্ধ করিয়া বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দিল্লীর বাদশাহদের এমন শক্তি ছিল না যে, এই সব রাজ্য পুনরায় জয় করিয়া লইতে পারেন। একে একে আরও অনেক প্রদেশ বাদশাহদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। প্রাদেশিক রাজা ও নবাবরা নামে মাত্র বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া গেলেন। তারপর আসিল পর পর নাদিরশাহ ও আহমদ শাহ দুর্‌রাণীর দিল্লী আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে দিল্লীর সাম্রাজ্য সংকুচিত হইয়া দিল্লী নগরের চারিপাশে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল ; বাদশাহী গৌরবের অবসান হইল। বাদশাহরা তখন শক্তিশালী ওমরাহ বা রাজাদের খেলার পুতুল হইয়া রহিলেন।

**ইংরাজ আধিপত্যের সূচনা।** অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, মুঘল শক্তির পতনের যুগে, সমস্ত ভারতবর্ষ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্য। এই সকল রাজ্যের রাজাদের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াছিল। কোথাও শান্তি ছিল না ; লোকের মনে স্বস্তি ছিল না। এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যেই ভারতে ইংরাজ আধিপত্যের সূত্রপাত হইল।

**ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা।** অন্যান্য কয়েকটি ইউরোপীয় জাতির ন্যায় ইংরাজরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে

তাহারা মোটামুটি বাণিজ্য বিস্তার লইয়াই ব্যস্ত ছিল। এই উপলক্ষে ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। এক জাতি অপর জাতিকে বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল এবং সকলেই এজন্য সৈন্যবল রাখিত। ঔরংজীব যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন ইহাদের মনে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা জাগে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন সমস্ত দেশ অরাজকতায় ভরিয়া গেল, তখনই ইংরাজ ও ফরাসীদের মনে বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। অরাজকতা হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য ইহারা নানাস্থানে দুর্গ নির্মাণ করিল ও সৈন্যবল বাড়াইল। আবার দেশীয়রাজারাও পরস্পরের সহিত যুদ্ধে ইহাদের নিকট সৈন্য সাহায্য লইলেন এবং বিনিময়ে ইহাদের জায়গীর ও নানা-প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে লাগিলেন।

ডুপ্লে

**দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তার।** অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ফরাসী বণিক কোম্পানীর গভর্ণর ছিলেন ডুপ্লে নামে একজন চতুর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি দেশীয় রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিলেন। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট ও হায়দরাবাদ রাজ্যে এই সময় সিংহাসন লইয়া বিভিন্ন দাবিদারদের মধ্যে বিরোধ শুরু হইয়াছিল। ডুপ্লে এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি উভয় রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজের মনোনীত

দাবিদারদের কর্ণাট ও হায়দরাবাদের সিংহাসনে বসাইলেন। কৃতজ্ঞ রাজারা ফরাসীদের বিস্তীর্ণ জায়গীর ও অর্থ দিলেন। ডুপ্লের চেষ্টায় ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ইংরাজরা তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ফরাসী প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া তাহারা অপর দাবিদারদের পক্ষ গ্রহণ করিল। উভয় জাতির মধ্যে তখন দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরাজপক্ষে ডুপ্লের প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি ছিলেন ক্লাইভ। প্রায় ১২।১৩ বৎসর যুদ্ধের পর ফরাসীরা ইংরাজদিগের নিকট পরাজিত হইল। তখন ভারতে ফরাসী প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইল এবং ইংরাজ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইল। কর্ণাটের নবাব ও নিজাম ফরাসীদের যে জায়গীর দিয়াছিলেন তাহা ইংরাজদের দিলেন। দাক্ষিণাত্যে এইরূপে ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

লর্ড ক্লাইভ

**বাংলায় ইংরাজ আধিপত্যের সূত্রপাত।** দাক্ষিণাত্যে যখন ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, সেই সময় বাংলা দেশেও ধীরে ধীরে ইংরাজদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। সম্রাট ঔরংজীবের রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণক, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহের অনুমতিক্রমে ভাগীরথী নদীর তীরে সুতানুটি, কালিঘাট ও গোবিন্দপুর নামে তিনখানি গ্রাম লইয়া একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিলেন। ইহাই পরে কলিকাতা নামে

প্রসিদ্ধ হইল। এখানে ফোর্ট উইলিয়ম নামে একটি দুর্গ স্থাপিত হইল। কলিকাতা হইল বাংলাদেশে ইংরাজ শক্তির কেন্দ্র। কলিকাতা স্থাপিত হইবার প্রায় ৬০ বৎসর পরে বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। তাঁহার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। সিরাজ বয়সে ছিলেন তরুণ এবং শাসন কার্যেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না। ইহা ছাড়া রাজ্যের বড় বড় ওমরাহেরা ছিলেন তাঁহার শত্রু। সিংহাসন লাভ করিয়াই তিনি ইংরাজদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজ দেখিলেন, বিদেশীদের শক্তি যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হইবে। এজন্য তিনি বাংলায় ইংরাজদের প্রতিপত্তি খর্ব করিতে সচেষ্ট হইলেন। সুতরাং নবাবের সহিত ইংরাজদের ঘোরতর বিবাদ বাধিল। দাক্ষিণাত্য হইতে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলায় আসিলেন। তিনি গোপনে মীরজাফর, জগৎ শেঠ প্রভৃতি নবাবের বড় বড় ওমরাহদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। স্থির হইল, সিরাজকে রাজ্যচ্যুত

মীরজাফর

করিয়া মীরজাফরকে নবাবী দেওয়া হইবে। এই সাহায্যের বিনিময়ে মীরজাফর ইংরাজদের প্রচুর অর্থ দিবেন।

পলাশীর যুদ্ধ। মাত্র তিন হাজার সৈন্য লইয়া ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকটে পলাশীর রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। নবাবের সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর ; তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সিরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজ পক্ষ জয়লাভ করিল এবং মীরজাফর বাংলার নবাবী লাভ করিলেন। সিরাজ মীরজাফরের হাতে ধরা পড়িয়া নিহত হইলেন। পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার স্বাধীনতা লোপ পাইল এবং বাংলাদেশে ইংরাজ শক্তির অভ্যুদয় ঘটিল। মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজরাই প্রকৃতপক্ষে পিছন হইতে রাজ্য পরিচালনা করিতে শুরু করিল। ইংরাজ কর্মচারীরা অকর্মণ্য মীরজাফরের উপর অনবরত অর্থের জন্য চাপ দিতে লাগিল। ইহাদের দাবি ক্রমে এত বাড়িয়া গেল যে, নবাব বিরক্ত হইয়া চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সঙ্গে ইংরাজদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন। তখন ইংরাজরা মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে নবাবী দিল।

মীরকাসিম

মীরকাসিম। নবাব হইয়া মীরকাসিম দেখিলেন, বাংলাদেশে ইংরাজরাই সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; নবাবকে কেহ বড় গ্রাহ্যই করে না। তাহা ছাড়া বাণিজ্যের নামে কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীরা বাংলার সম্পদ

অন্যায়ভাবে শোষণ করিয়া লইতেছে। তিনি বাংলা দেশকে বাঁচাইবার জন্য ইংরাজ শক্তি বিনষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংরাজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাসিম অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মীরকাসিমের পক্ষ লইয়া সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজরা জয়লাভ করিল ; বাংলাদেশ হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে ইংরাজ আধিপত্য বিস্তৃত হইল। কিন্তু তখনও ইংরাজরা সরাসরি এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিল না। বৃদ্ধ মীরজাফরকে আবার সিংহাসনে বসান হইল।

**বাংলায় ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠা।** ইহার এক বৎসর পরে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ বাদশাহ শাহ আমলের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া

শাহ আলম কর্তৃক দেওয়ানী মঞ্জুর

কোম্পানীর নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলার শাসন

কর্তৃত্ব দুই ভাগে ভাগ হইল। কোম্পানীর হাতে আসিল রাজস্ব আদায়ের ভার আর নবাবের হাতে রহিল বিচার ও শাসনের ভার। কোম্পানী নবাবের জন্য একটি বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিল। এখন হইতে প্রকৃতপক্ষে বাংলার উপর ইংরাজ আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইংরাজেরা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইল। বাংলার অপরিমিত ধনসম্পদ ইংরাজদের ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সহায়তা করিল।

শাহ আলম

দেওয়ানী লাভ করিয়া ক্লাইভ বাংলায় যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করিলেন তাহাতে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে ইংরাজ কোম্পানী পুরাপুরি বাংলাদেশের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস্

**ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য বিস্তার।** ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হইল। দাক্ষিণাত্যে ও বাংলাদেশে ইংরাজ আধিপত্যের ভিত্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার পর ইংরাজরা দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করিল। ভারতীয়

রাজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ইংরাজদের লক্ষ্য সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। পলাশী যুদ্ধের পর এক শতাব্দীর মধ্যে ইংরাজ জাতি ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া বসিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে ইংরাজদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না।

হাইদার আলি

**মহীশূর যুদ্ধ—হায়দার আলি ও টিপু সুলতান।** ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে মহীশূর, মারাঠা ও শিখদের নিকট হইতেই আসিয়াছিল সবচেয়ে প্রবল বাধা এবং এই তিনটি শক্তির সহিত ইংরাজদের বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হায়দর আলি নামে এক অতি প্রতিভাশালী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া ইহাকে একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। হায়দর লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ কোনদিন পান নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা, কর্মশক্তি, সাহস ও বুদ্ধি ছিল অসামান্য। রাজা হইয়া হায়দর দূরদর্শিতা ও শাসন দক্ষতাবলে মহীশূর রাজ্যের আয়তন বাড়াইয়া ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর রাজ্যে পরিণত করিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন রণকুশল সেনাপতি এবং অপরদিকে ছিলেন সুনিপুণ, সরল ও উদার স্বভাব এবং ন্যায়ানুবর্তিতার প্রতি অনুরাগী। শাসনকার্যের সকল

ব্যাপারের উপর তাঁহার খর দৃষ্টি ছিল। প্রজার কল্যাণ সাধন করিবার আগ্রহও তাঁহার ছিল।

হায়দরের শত্রুর অভাব ছিলনা। তাঁহার শক্তি ক্রমাগত বাড়িতেছে দেখিয়া নিজাম, মারাঠা ও ইংরাজ একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। চতুর হায়দর নিজাম ও মারাঠাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সমস্ত সৈন্য লইয়া ইংরাজদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হইল, হায়দর মাদ্রাজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তখন বাধ্য হইয়া ইংরাজরা তাঁহার সহিত সন্ধি করিল। ইহার পর হায়দরের সহিত ইংরাজদের আর একবার যুদ্ধ হইল। হায়দর তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি অপূর্ব সাহস ও ক্ষিপ্রতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া বার বার ইংরাজদের পরাজিত করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই হায়দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান সিংহাসন লাভ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে উভয়পক্ষে সন্ধি হইল।

টিপু সুলতান

টিপু বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সাহসী, কর্মঠ, রণ-কুশল, সুশাসক ও বিদ্বান ছিলেন। তাঁহার নৈতিক চরিত্রও ছিল কলঙ্কহীন। ইহা ছাড়া তিনি পিতার ন্যায় সদাশয় ও দৃঢ় চরিত্র ছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

টিপু ইংরাজদের সন্দেহের চোখে দেখিতেন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, উহাদের বিতাড়িত করিতে না পারিলে এদেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে। এজন্য তিনি ইংরাজদের শত্রু ফরাসীদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। এই সময় ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল।

টিপুর আচরণে ভীত হইয়া ইংরাজ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। নিজাম ও মারাঠারা ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দিল। দুই বৎসরযুদ্ধের পর পরাজিত হইয়া টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার সাত বৎসর পরে ইংরাজদের সহিত টিপুর শেষ যুদ্ধ হইল। লর্ড ওয়েলেসলি টিপুকে ইংরাজদের সামন্ত হইতে বলিলেন। টিপু ঘৃণার সহিত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া টিপু প্রাণ দিলেন; তথাপি দেশের স্বাধীনতা বিকাইতে রাজী হইলেন না। মহীশূরের এক অংশ পুরাতন হিন্দু রাজবংশের এক শিশুকে দেওয়া হইল; বাকি অংশ ইংরাজ ও মারাঠারা ভাগাভাগি করিয়া লইল। ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসীর সাহায্যেই ইংরাজরা তাহাদের পরাধীন দাসে পরিণত করিল। ইংরাজ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভারতবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী দ্বারা মসীলিপ্ত হইয়া আছে।

মারাঠা সাম্রাজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিবাজীর পৌত্র শাহু মারাঠা রাজ্যের রাজা হইলেন। তিনি বালাজী বিশ্বনাথ নামে একজন সুচতুর ও সুদক্ষ ব্রাহ্মণ কর্মচারীকে 'পেশবা' বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিলেন। পেশবা অনতিবিলম্বে রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। শিবাজীর বংশধরগণ নামে মাত্র রাজা রহিলেন। পেশবা পদও বংশগত হইয়া পড়িল। পরবর্তী পেশবাদের শাসনকালে

প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতের এক অংশে মারাঠা-শক্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। পেশবা বাজীরাওয়ের শাসনকালে মারাঠা সাম্রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইল এবং রণোজী সিন্ধিয়া, মলহররাও হোলকার, রঘুজী-ভোঁসলা, ও পিলাজী গায়কবার যথাক্রমে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বেরার ও বরোদার শাসনভার লাভ করিলেন। পেশবা স্বয়ং পুণায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সকলে পেশবার অধীন হইলেও কার্যত স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

বাজীরাও

বালাজী বাজীরাওয়ের শাসনকালে মারাঠা শক্তির চরম বিকাশ ঘটিল এবং পঞ্জাব পর্যন্ত মারাঠা অধিকার বিস্তৃত হইল। কিন্তু মারাঠাদের এ সৌভাগ্য স্থায়ী হইল না। পঞ্জাব হইতে মারাঠাদের বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ হুর্‌রাণী ভারত আক্রমণ করিলেন। উত্তর ভারতের অনেক মুসলমান রাজা তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। আবার মারাঠাদের অত্যাচারের ফলে বড় বড় হিন্দুরাজা তাহাদের সাহায্য করিলেন না। পাণিপথের প্রান্তরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল (১৭৬১)। মারাঠারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। প্রায় দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য নিহত হইল। পাণিপথের পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল এবং ভারতব্যাপী মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা লোপ পাইল। ইহার পর মারাঠা রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং এই সুযোগে ইংরাজরা মারাঠাদের হঠাইয়া দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হইল।

**ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।** ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পেশবা নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়া তাঁহার খুল্লতাত রঘুনাথ নিজে পেশবা হইয়া বসিলেন। কিন্তু একদল মারাঠা নায়ক রঘুনাথকে পেশবা বলিয়া মানিতে অস্বীকার করিয়া নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশবা পদে বরণ করিলেন। এই দলের প্রধান ছিলেন একজন অসামান্য প্রতিভাশালী কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালাজী জনার্দন। ইতিহাসে নানাফড়নবিশ নামে ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ।

নানাফড়নবিশ

রঘুনাথ ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজরা রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ইহা মোটামুটি ৪৩ বৎসর চলিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মারাঠা শক্তির পতনে শেষ হইল। এই যুদ্ধকালে মারাঠাদের মধ্যে নানাফড়নবিশ ও মাহাদাজী সিন্ধিয়া নামে দুইজন শক্তিশালী নায়কের আবির্ভাব ঘটে।

মাহাদাজী সিন্ধিয়া

সুচতুর নানাফড়নবিশ সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা নায়কদের স্বপক্ষে আনিয়া চারিদিক হইতে ইংরাজ বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কয়েক বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর সন্ধি হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদের বিশেষ কোন লাভ হইল না।

সন্ধির পরে মারাঠা সাম্রাজ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। মারাঠা নায়কগণ প্রভুত্ব লইয়া পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইলেন। এই গোলযোগের মধ্যে মাহাদাজী সিন্ধিয়া এবং নানা ফড়নবিশ উভয়েরই মৃত্যু হইল। ইঁহাদের মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্যে যেটুকু ঐক্য ও শৃঙ্খলা ছিল তাহারও অবসান হইল। এই সময় লর্ড ওয়েলেস্‌লি ছিলেন বৃটিশ ভারতের গভর্ণর-জেনারেল। কার্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি সমস্ত ভারতে একচ্ছত্র ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'সামন্ত-তান্ত্রিক সন্ধি' নামে এক নূতন নীতি প্রচার করিলেন। তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গকে ইংরাজদের মিত্র হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। এরূপ মিত্র রাজারা ইংরাজ প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন এবং অপর কোন রাষ্ট্রের সহিত ইংরাজদের অনুমতি ছাড়া কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না। ইহার বিনিময়ে ইংরাজ শক্তি মিত্র রাজাদের রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। এই নীতি প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা আক্রমণে বিব্রত নিজাম সন্ধির সর্ত গ্রহণ করিয়া ইংরাজদের আশ্রয় লইলেন। অযোধ্যার নবাবও এই পথ অনুসরণ করিলেন। ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

মারাঠা সাম্রাজ্যে তখন বড় দুর্দিন দেখা দিয়াছিল; পেশবা ছিলেন ২য় বাজীরাও। হোলকারের হাতে পরাজিত হইয়া তিনি ওয়েলেসলির সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি গ্রহণ করিলেন। তখন অন্যান্য

মারাঠা নায়কদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। জাতির এই চরম সঙ্কট কালেও মারাঠা নায়করা পরস্পর বিদ্বেষ ভুলিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। ইংরাজরা একে একে ভোঁসলা ও সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের সামন্ত-তান্ত্রিক সন্ধি গ্রহণে বাধ্য করিলেন। কিছুকাল পরে হোলকারও পরাজিত হইয়া ইংরাজের আশ্রয় লইলেন।

ওয়েলেসলি মারাঠা রাজ্যের ধ্বংস সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সময়ে যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল তাহার ফলে মারাঠা শক্তির পতন অনিবার্য হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের শাসন কালে পেশবা ও ইংরাজদের মধ্যে শেষ শক্তি পরীক্ষা হইল। ইংরাজদের হাতে পরাজিত হইয়া মারাঠা শক্তির পতন হইল। রাজ্যচ্যুত পেশবা একটি বার্ষিক বৃত্তি লইয়া পুনা ত্যাগ করিয়া কানপুরের নিকট বিঠুরে বাস করিতে লাগিলেন।

রণজিৎ সিংহ

**রণজিৎ সিংহ—শিখ শক্তির অভ্যুদয়।** মারাঠাদের পতনের পরে পঞ্জাবের শিখ জাতি ছাড়া ভারতে ইংরাজদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ রহিল না। সুতরাং মারাঠাদের পতনের পরে আসিল শিখদের পালা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রণজিৎ সিংহ নামে একজন শিখ নায়ক পঞ্জাবে একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজী ও হায়দর আলির ন্যায় রণজিৎ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু তিনিও

তাঁহাদের মত তীক্ষ্ণধী, সাহসী, রণকুশল এবং অসামান্য রাজনীতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধের চেতনা তিনি আনিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য। তিনি রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করেন এবং সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়া রাজ্যের সামরিক বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইংরাজদের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয়। তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন ইংরাজদের সহিত কোন বিরোধ করেন নাই। পূর্বে শতদ্রু নদী হইতে পশ্চিমে পেশোয়ার পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

**শিখ যুদ্ধ।** রণজিতের মৃত্যুর পরেই শিখ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাঁহার দুর্ধর্ষ খালসা সৈন্য রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া নিজেদের খুশীমত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিতে লাগিল। শিখ রাজ্যে যখন বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ চলিতেছিল তখন ইংরাজদের সহিত শিখদের ভীষণ দ্বন্দ্ব বাধিল। ১৮৪৫ এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার ইংরাজদের সহিত শিখদের যুদ্ধ হইল ; দুইবারই শিখরা পরাজিত হইল। লর্ড ডালহৌসী দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পরে পঞ্জাব রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। প্রথম শিখ যুদ্ধের পরে গোলাবসিংহ নামে রণজিতের একজন কর্মচারীর নিকট কাশ্মীর বিক্রয় করিয়া ইংরাজরা ৭৫ লক্ষ টাকা লইল। গোলাবসিংহ বৃটিশের অধীনে কাশ্মীরের সামন্ত রাজা হইলেন। শিখদের পরাজয়ের পরে সমস্ত ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে ব্রহ্মদেশ ও সিন্ধুদেশ ইংরাজদের অধীনস্থ হইল।

*সিপাহী-বিদ্রোহ।* ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর ভারতে ইংরাজ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার পরবর্তী একশত বৎসরের

মধ্যে ধীরে ধীরে ইংরাজ প্রাধান্য সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজ সাম্রাজ্য ভারতে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই এক দুর্যোগ আসিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূল পর্যন্ত উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমান বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার সংকল্প লইয়া অস্ত্র ধারণ করিল। ইতিহাসে ইহা সিপাহীবিদ্রোহ নামে খ্যাত।

শিখদের পরাজয়ের পর ভারতে শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া কিছু ছিল না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজারা সকলেই ছিলেন বৃটিশ প্রভুর সামন্ত। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-'৫৬) ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যগুলিকেও অন্যায়ভাবে একে একে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে দেশী রাজাদের মধ্যে ইংরাজদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ দেখা দিল।

লর্ড ডালহাউসী

এদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রচলনের ফলে সাধারণ লোকের মনে ধারণা হইল যে, ইংরাজরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে সর্বত্র উত্তেজনা দেখা দিল। এই সময় কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হইল। সিপাহীদের মন যখন ধর্মনাশের আশঙ্কায় সন্দেহাকুল তখন সৈন্য বিভাগ হইতে বন্দুকে এক প্রকার নূতন টোটা ব্যবহারের আদেশ আসিল। বন্দুকে ভরিবার সময় টোটা দাঁতে কাটিয়া লইতে হইত। গুজব রটিল, টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মাখান আছে।

দাঁতে কাটিলে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই জাতি যাইবে এবং ইংরাজরা জাতিনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই টোটা ব্যবহারের আদেশ দিয়াছে।

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহ বাংলাদেশে শুরু হইয়া দেখিতে দেখিতে ক্রমে মীরাট, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, বিহার, দিল্লী ও ঝান্সীতে ছড়াইয়া পড়িল। সিপাহীরা যেখানে পাইল নির্বিচারে ইংরাজদের হত্যা করিল সিপাহীরা ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য ছাড়া উত্তর ভারতের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এবং দিল্লী অধিকার করিয়া বাহাদুর শাহকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিল। কানপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন রাজ্যচ্যুত পেশবা ২য় বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেব। মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন ঝান্সীর বীররাণী লক্ষ্মীবাঈ। বিদ্রোহের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন তাঁতিয়াতোপী, আজিম উল্লা খাঁ, খাঁ বাহাদুর খাঁ এবং কুমার সিংহ। যুদ্ধে সিপাহীরা অসীম সাহস ও বীরত্ব দেখাইলেও শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরাজয় হইল। ইংরাজসৈন্য

বাহাদুর শাহ

ভারতবর্ষ
ইংরাজের রাজ্য বিস্তার
১৭৬৫-১৮৫৮ খৃঃ
১৮৯৫
কাশ্মীর ১৮৪৬
পাঞ্জাব ১৮৪৯
ব্রিটিশ বেলুচিস্তান
১৮১৫
১৮০১
১৮০৩
রাজপুতানা ১৮১৮
১৮১৮
অযোধ্যা ১৮৫৬
১৮০১
১৮০১
আসাম ১৮২৬
বিহার ১৭৬৫
সিন্ধু ১৮৪৩
মালব ১৮১৮
১৮১২
বঙ্গদেশ ১৭৬৫
কলিকাতা
১৮১৫-১৮
১৮০৩-৭
উড়িষ্যা ১৮০৩
সুরাট
মারাঠা
বেরার ১৮৫৩
ভোঁসলা
১৮১৭
বোম্বাই ১৬১৬
নিজাম রাজ্য ১৮০০
১৮৪৮
উত্তর সরকার ১৭৬৬
মসলিপত্তম ১৬২০
কর্ণেল ১৮৩৯
মহীশূর ১৮৩১
মাদ্রাজ ১৬৩৯
ত্রিবাঙ্কুর ১৭৮৮
সিংহল ১৭৯৫

একে একে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলি দখল করিয়া লইল। সম্রাট বাহাদুরশাহ বন্দী হইয়া ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হইলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের নৃশংসভাবে দিল্লীর রাজপথে হত্যা করা হইল। নানাসাহেব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। বীররাণী লক্ষ্মীবাঈ শেষ পর্যন্ত অসীম বীরত্বের সহিত লড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। তাঁহার বীরত্বে ইংরাজরাও মুগ্ধ হইয়াছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া

বিদ্রোহ শেষ হইবার পরেই ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান করা হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজের হাতে ভারতের শাসনভার লইলেন। এক ঘোষণা-পত্রে স্পষ্ট ভাবে প্রচার করা হইল যে, ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর ধর্ম ও আচারব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না; যোগ্যতা থাকিলে সকল ভারতবাসীর সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে এবং ভবিষ্যতে অন্যায়ভাবে কোন দেশীয় রাজ্য অধিকার করা হইবে না।

এলাহাবাদে এক দরবার ডাকিয়া লর্ড ক্যানিং এই ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন।

## কালপঞ্জী

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—১৬০০

ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—১৬৬৪

**ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ**—দাক্ষিণাত্যে অধিকার স্থাপন।

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ—১৭৪৬—১৭৪৮

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ—১৭৪৯—১৭৫৮

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ—১৭৫৬—১৭৬৩

**বাংলায় ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তার**

কলিকাতা স্থাপন—১৬৯০

পলাশীর যুদ্ধ—১৭৫৭

মীর কাশিমের পরাজয়—১৭৬৪

দেওয়ানী লাভ—১৭৬৫

**ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য বিস্তার**

ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—(১) ১৭৬৬—৬৯ (২) ১৭৮০—'৮৪
(৩) ১৭৯০—'৯২ (৪) ১৭৯৯

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ—(১) ১৭৭৫—১৭৮২ (২) ১৮০২—১৮০৫
(৩) ১৮১৭—'১৮

ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ—(১) ১৮৪৫—'৪৬ (২) ১৮৪৮—'৪৯

সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সমর—১৮৫৭—'৫৮

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্র—১৮৫৮

---

## আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ

সপ্তদশ শতাব্দীতে, ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজত্বকালে, দলে দলে ইংরাজ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূলে বসতি স্থাপন করিতে থাকে। ইহারা আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের বিতাড়িত করিয়া এবং বনজঙ্গল কাটিয়া সেখানে গ্রাম ও নগর গড়িয়া তোলে। ইউরোপ হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অসভ্য জাতির বাসভূমি আমেরিকাতে নূতন করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার একটি বড় কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এইরূপে প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে বর্তমান আমেরিকা জন্মগ্রহণ করিল।

**আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশের অবস্থা।** অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকায় ইংরাজদের তেরটি উপনিবেশ ছিল। ইংলণ্ডের রাজার অধীনে উপনিবেশগুলি আভ্যন্তরীণ শাসনে প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। প্রত্যেক উপনিবেশে ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর থাকিতেন। কিন্তু গভর্ণরের ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ ছিল। একটি বিষয়ে উপনিবেশগুলি কতক পরিমাণে অসুবিধা ভোগ করিত। ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইংলণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিত এবং নিজের স্বার্থের জন্য উপনিবেশগুলির উপরে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কয়েকটি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছিল। ইহার ফলে উপনিবেশগুলির শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি হইল। ইহাতে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিকদের মধ্যে অসন্তোষ যাহাতে খুব বৃদ্ধি না পায় এজন্য ইংলণ্ড বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি খুব কঠোর ভাবে প্রয়োগ করিত না। ঔপনিবেশিকরাও বিধি-নিষেধগুলি যথা সম্ভব এড়াইয়া চলিত। এই সময়ে আমেরিকায় কতকগুলি

ফরাসী উপনিবেশ ছিল এবং ফরাসীরা আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ইংরাজ উপনিবেশগুলি জয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। ফরাসীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরাজ উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধতা করিতে তাহারা সাহস পায় নাই।

**আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের কারণ।** সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ হইতেই সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং সমগ্র বিশ্বে বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের প্রশ্ন লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, যেখানেই ইংরাজ ও ফরাসী বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল সেখানেই উভয় জাতির বণিকদের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ চলিতেছিল। এই সংঘর্ষ চরমে পৌঁছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই সময় ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা বিরাট যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা সপ্তবর্ষ সমর নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ ইউরোপ হইতে উপনিবেশগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িল। যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হইল এবং আমেরিকায় তাহাদের উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের হাতে গেল। আমেরিকায় ফরাসীদের পরাজয়ের ফলে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের মনোভাবে এক পরিবর্তন দেখা দিল। এতদিন ফরাসীদের ভয়ে তাহারা ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের বাণিজ্যের উপর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাধা-নিষেধ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় নাই। এখন ফরাসী-ভীতি দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির কর্তৃত্ব তাহাদের অসহ্য বোধ হইল এবং উপনিবেশগুলির মনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল।

আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের মনোভাবে যখন এই পরিবর্তন

## আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ

সপ্তদশ শতাব্দীতে, ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজত্বকালে, দলে দলে ইংরাজ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূলে বসতি স্থাপন করিতে থাকে। ইহারা আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের বিতাড়িত করিয়া এবং বনজঙ্গল কাটিয়া সেখানে গ্রাম ও নগর গড়িয়া তোলে। ইউরোপ হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অসভ্য জাতির বাসভূমি আমেরিকাতে নূতন করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার একটি বড় কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এইরূপে প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে বর্তমান আমেরিকা জন্মগ্রহণ করিল।

**আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশের অবস্থা।** অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকায় ইংরাজদের তেরটি উপনিবেশ ছিল। ইংলণ্ডের রাজার অধীনে উপনিবেশগুলি আভ্যন্তরীণ শাসনে প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। প্রত্যেক উপনিবেশে ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর থাকিতেন। কিন্তু গভর্ণরের ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ ছিল। একটি বিষয়ে উপনিবেশগুলি কতক পরিমাণে অসুবিধা ভোগ করিত। ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইংলণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিত এবং নিজের স্বার্থের জন্য উপনিবেশগুলির উপরে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কয়েকটি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছিল। ইহার ফলে উপনিবেশগুলির শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি হইল। ইহাতে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিকদের মধ্যে অসন্তোষ যাহাতে খুব বৃদ্ধি না পায় এজন্য ইংলণ্ড বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি খুব কঠোর ভাবে প্রয়োগ করিত না। ঔপনিবেশিকরাও বিধি-নিষেধগুলি যথা সম্ভব এড়াইয়া চলিত। এই সময়ে আমেরিকায় কতকগুলি

ফরাসী উপনিবেশ ছিল এবং ফরাসীরা আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ইংরাজ উপনিবেশগুলি জয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। ফরাসীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরাজ উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধতা করিতে তাহারা সাহস পায় নাই।

**আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের কারণ।** সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং সমগ্র বিশ্বে বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের প্রশ্ন লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, যেখানেই ইংরাজ ও ফরাসী বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল সেখানেই উভয় জাতির বণিকদের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ চলিতেছিল। এই সংঘর্ষ চরমে পৌঁছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই সময় ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা বিরাট যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা সপ্তবর্ষ সমর নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ ইউরোপ হইতে উপনিবেশগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িল। যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হইল এবং আমেরিকায় তাহাদের উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের হাতে গেল। আমেরিকায় ফরাসীদের পরাজয়ের ফলে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের মনোভাবে এক পরিবর্তন দেখা দিল। এতদিন ফরাসীদের ভয়ে তাহারা ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের বাণিজ্যের উপর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাধা-নিষেধ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় নাই। এখন ফরাসী-ভীতি দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির কর্তৃত্ব তাহাদের অসহ্য বোধ হইল এবং উপনিবেশগুলির মনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল।

আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের মনোভাবে যখন এই পরিবর্তন

আসিয়াছিল তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্রেণভিল উপনিবেশগুলি হইতে কিছু অর্থ আদায় করিবার নিমিত্ত কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সপ্তবর্ষ সমরে ইংলণ্ডের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ইহার কিছু পরিমাণ উপনিবেশগুলি রক্ষার জন্য হইয়াছিল। তিনি মনে করিলেন যে, এই ব্যয়ের এক অংশ ঔপনিবেশিকদের দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ রেড ইণ্ডিয়ানরা মাঝে মাঝে আমেরিকানদের আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিত। ভবিষ্যতে এই আক্রমণ নিবারণের জন্য তিনি আমেরিকায় একটি সৈন্যবাহিনী রাখিতে মনস্থ করিলেন। সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার আংশিক উপনিবেশগুলি হইতে তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি আইন করিলেন। প্রথমেই তিনি বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিয়া শুল্ক হইতে আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর তিনি ষ্ট্যাম্প আইন প্রণয়ন করিলেন। ইহাতে স্থির হইল, মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত দলিলে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং ষ্ট্যাম্প বেচিয়া যে কর আদায় হইবে তাহা হইতে সৈন্যবাহিনীর খরচ বহন করা হইবে। ষ্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে আমেরিকানরা তীব্র প্রতিবাদ করিল। তাহারা ঘোষণা করিল যে, প্রজার সম্মতি না লইয়া তাহাদের উপর কোন কর বসাইবার অধিকার রাজার নাই। তাহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা হইলে সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হইল; জনতা ষ্ট্যাম্প কাগজ আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল। বার্ক, চ্যাথাম প্রভৃতি ইংলণ্ডের

এডমণ্ড বার্ক

কয়েকজন মনীষী আমেরিকার প্রতি গ্রেণভিলের এই নীতি অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। গ্রেণভিল পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু আমেরিকায় গোলমাল থামিল না। পরবর্তী আর একজন মন্ত্রী আমেরিকার অধিবাসীদের সম্মতি না লইয়া আমেরিকার কয়েকটি আমদানি মালের উপর শুল্ক বসাইলেন। ইহার ফলে সর্বত্র তীব্র গোলমাল দেখা দিল। আমেরিকানরা এই সব মালের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিল। তখন প্রধানমন্ত্রী নর্থ এক মাত্র চায়ের উপর সামান্য শুল্ক রাখিয়া আর সব দ্রব্যের উপর শুল্ক নাকচ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন এই সামান্য শুল্ক দিতে আমেরিকানদের আপত্তি হইবে না। কিন্তু তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। কর অথবা শুল্কের পরিমাণ লইয়া আমেরিকানরা আপত্তি করে নাই। বিরোধের মূল কারণ ছিল আমেরিকানদের সম্মতি না লইয়া তাহাদের উপর কর নির্ধারণের অধিকার ইংরাজ সরকারের আছে কি না। সুতরাং গোলমাল বাড়িয়াই চলিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকখানি জাহাজ ভারত হইতে চা লইয়া বোষ্টন বন্দরে উপস্থিত হইল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া একদল আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়া প্রায় সমস্ত চা সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। তখন ইংরাজ সরকার আমেরিকানদের দমন করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন এবং আমেরিকায় সৈন্য পাঠাইলেন। উপনিবেশগুলিও তখন সংঘবদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এইরূপে আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের সূচনা হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার একবৎসর পরে, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, আমেরিকার সমস্ত উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়া নগরে বিখ্যাত 'স্বাধীনতা-ঘোষণা পত্র' প্রকাশ করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। সেদিন হইতে স্বাধীন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিল। এই ৪ঠা জুলাই তারিখে প্রতি বৎসর আমেরিকানরা স্বাধীনতা দিবস পালন করে।

**জর্জ ওয়াশিংটন ও স্বাধীনতা লাভ।** জর্জ ওয়াশিংটন নামে একজন দেশপ্রেমিক জননায়ক স্বাধীনতা সমরে আমেরিকানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি ভার্জিনিয়া উপনিবেশের এক সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি সৈন্য-বিভাগে সেনাপতির পদ লাভ করেন। ওয়াশিংটন ছেলেবেলা হইতেই সৎ, সত্যবাদী, কর্মঠ ও সাহসী ছিলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন

তাঁহার শান্ত, গাম্ভীর্য, সাধু ও ভদ্র ব্যবহার এবং অনাবিল দেশপ্রেম তাঁহাকে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। যুদ্ধ পরিচালনার ভার্ গ্রহণ করিয়া তিনি সৈন্যদের মধ্যে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিলেন এবং তাহাদের সহিত সমভাবে সকল দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইলেন। কোন অসুবিধাই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না, পরাজয় তাঁহাকে হতাশ করিতে পারিত না। সমস্ত সৈন্য তাঁহার অনুরাগী ছিল এবং মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিত।

ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকানরা অপূর্ব বীরত্বের সহিত ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রায় আট বৎসর যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার তিন বৎসর পরে ফ্রান্স ও স্পেন আমেরিকানদের পক্ষ লইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। আরও কয়েক বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিশ পরাজিত
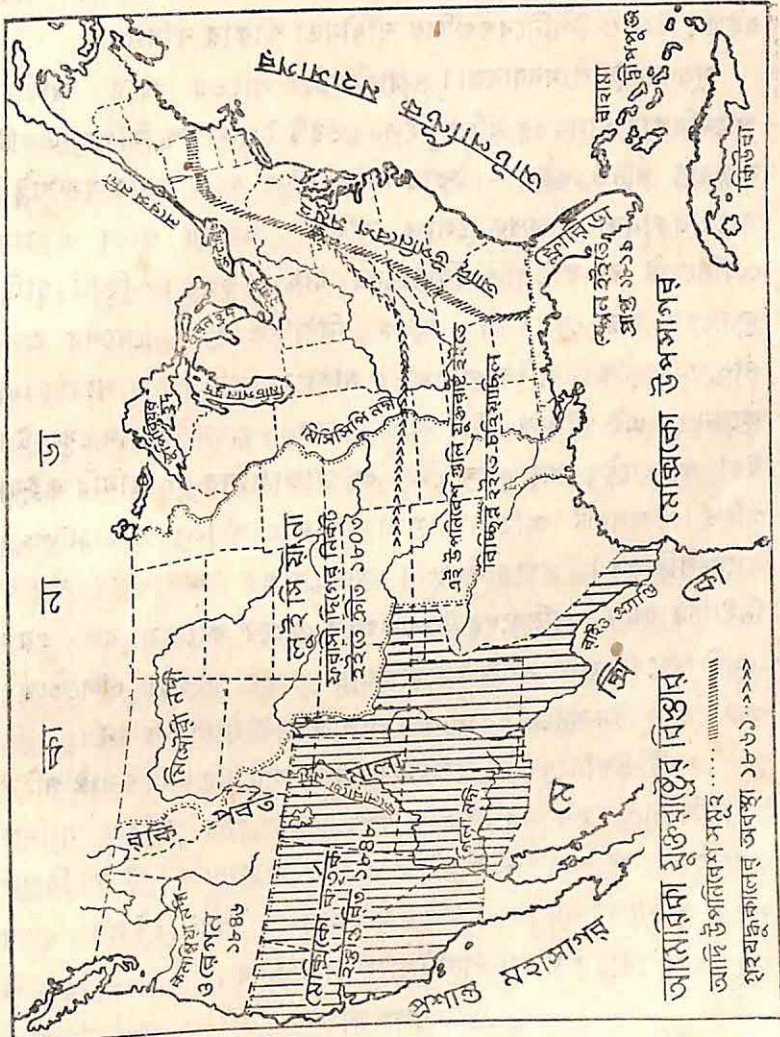
কা না ডা
কলাম্বিয়া নদী
ওরেগন
১৮৪৬
মিসৌরী নদী
লুইসিয়ানা
ফরাসী দিগের নিকট
হইতে ক্রীত ১৮০৩
মেক্সিকো কর্তৃক
হস্তান্তরিত ১৮৪৮
মিসিসিপি নদী
এই উপনিবেশ গুলি যুক্তরাষ্ট্র হইতে
বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিয়াছিল
আদি উপনিবেশ সমূহ
আটলান্টিক মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
গিলা নদী
মে
ক্সি
কো
রাইও গ্রাণ্ড
স্পেন হইতে
প্রাপ্ত ১৮১৯
ফ্লোরিডা
বাহামা
দ্বীপপুঞ্জ
কিউবা
মেক্সিকো উপসাগর
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তার
আদি উপনিবেশ সমূহ
গৃহযুদ্ধকালের অবস্থা ১৮৬১

হইয়া ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এই কর্ণওয়ালিশ বৃটিশ ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। ইহার পর দুই পক্ষে সন্ধি হইল ; ইংলণ্ড উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিল।

**যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা।** স্বাধীনতা লাভের পরে স্বাধীন আমেরিকার শাসনতন্ত্র রচিত হইল। তেরটি উপনিবেশ মিলিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল। ইহার নাম হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকানরা রাজপদ লোপ করিল। রাজার স্থানে একজন প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা হইল। তিনি চারি বৎসরের জন্য দেশবাসী কর্তৃক নির্বাচিত হন। দেশের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিষদের সাহায্যে তিনি শাসন পরিচালনা করেন। এই পরিষদ দুইটি কক্ষে বিভক্ত। প্রথমটির নাম সেনেট। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ষ্টেট বা রাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। অপরটি প্রতিনিধি সভা ( House of Representatives ) নামে পরিচিত। ইহার সদস্যরা সমগ্র দেশের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। পরিষদের উভয়কক্ষকে একত্রে কংগ্রেস বলা হয়। এমনি ভাবেই আজ পর্যন্ত আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা চলিতেছে। জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন।

তেরটি উপনিবেশ বা ষ্টেট লইয়া প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। নূতন রাষ্ট্র শক্তি ও সম্পদে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কালক্রমে আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত ভূভাগের উপর ইহার অধিকার স্থাপিত হইল। এখন যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেটের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে আটচল্লিশ।

### কালপঞ্জী

আমেরিকার স্বাধীনতা সমর—১৭৭৫—১৭৮৩
জর্জ ওয়াশিংটন—১৭৩২—১৭৯৯
স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র—১৭৭৬

## ফরাসী-বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, ফরাসী দেশের জনসাধারণ সে যুগের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ করে। ইহার ফলে ফরাসী দেশের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং দুর্গত জনসাধারণ রাজা, অভিজাত-শ্রেণী ও চার্চের নিপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের এই বিদ্রোহ ফরাসী-বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ। ফরাসী-বিপ্লব বর্তমান যুগের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং ইহা ইউরোপ ও ইউরোপের বাহিরে মানুষের মনে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

**বিপ্লবের কারণ।** ফরাসী বিপ্লব কেন হইল ইহা বুঝিতে হইলে সে যুগে ফরাসীদেশে যেরূপ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, মানুষে মানুষে যে অসাম্য ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। ইউরোপের সর্বত্র তখন অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল।

**স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র।** সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ফ্রান্সের রাজারা ছিলেন অবাধ ক্ষমতার অধিকারী। ষ্টুয়ার্ট রাজাদের ন্যায় তাঁহারাও দৈবসত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাজ্যশাসনে প্রজাদের কোন অধিকার স্বীকার করিতেন না। দেশের ধনবল ও জনবল তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলিয়া মনে করিতেন। রাজারা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রজাদের শোষণ করিয়া অর্থ আদায় করিতেন। প্রজারা সামান্য প্রতিবাদ করিলে বিনা বিচারে রাজদণ্ড পাইত। রাজা অসন্তুষ্ট হইলে অতি

ক্ষমতাশালী লোককেও অনেক সময় চিরজীবনের জন্য অন্ধকূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিতেন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার উপায় ছিল না। বিলাস ব্যসনেও রাজারা অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। রাজদরবারের জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সীমা ছিল না; নিত্য আনন্দ উৎসব লাগিয়াই ছিল এবং তাহাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইত। আর এই অর্থ যোগাইতে হইত দরিদ্র প্রজাদের। তাহাদের দুঃখদুর্দশার অন্ত ছিল না।

**অভিজাতশ্রেণীর অবস্থা।** ফরাসী দেশের জনসাধারণ তখন মোটামুটি দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ লোক। অভিজাতরা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে ইহারাই সব রকম সুখসুবিধা ভোগ করিত, আরামবিরামে বাস করিত। দেশের অধিকাংশ জমিদারির মালিক ছিল অভিজাতরা। এই সকল জমিদারি হইতে অভিজাতদের প্রচুর অর্থাগম হইত এবং রাজাদের ন্যায় ইহারাও জাঁকজমক ও বিলাস ব্যসনে এই অর্থব্যয় করিত। বড় বড় অভিজাত জমিদাররা নিজেদের জমিদারিতে বাস করিত না; তাহারা রাজধানীতে বড় বড় অট্টালিকায় বাস করিত, নিয়মিত রাজদরবারে আসিয়া রাজার সভাসদের কাজ করিত। ইহারা রাজকোষ হইতে নিয়মিত বৃত্তি পাইত; কখন কখন রাজা খুশী হইয়া ইহাদের প্রচুর উপঢৌকন দিত। এই সকল অভিজাতরা নিজ নিজ জমিদারির প্রজার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিত, কিন্তু প্রজার সুখদুঃখের কোন খোঁজই লইত না।

আবার চার্চের বড় বড় যাজকরাও ছিল অভিজাত বংশের সন্তান। চার্চের হাতেও ছিল তখন অনেক ভূসম্পত্তি এবং তাহা হইতে আয়ও হইত প্রচুর। বড় বড় যাজকরা নিজ নিজ এলাকায়

বাস করিত না অথবা ধর্মসংক্রান্ত কর্তব্য পালন করিত না। ইহারাও রাজদরবারে আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইত। ফরাসী দেশের জনসংখ্যা তখন ছিল প্রায় আড়াই কোটি। ইহার মধ্যে অভিজাতদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪।৫ লক্ষ। এই মুষ্টিমেয় যাজক ও অভিজাতদের হাতে দেশের প্রায় সমস্ত ধন সম্পদ জড় হইয়াছিল এবং সর্বপ্রকার সুখসুবিধার অধিকারীও ইহারা ছিল। অথচ ইহারা রাজ্যশাসন নির্বাহের জন্য রাজকর দিত না। ইহাদের অধিকার ও নানাবিধ সুযোগ সুবিধা ছিল, অথচ কর্তব্য বা দায়িত্ব কিছু ছিল না। সমাজে ইহারা ছিল একটি পৃথক জাতি। রাজারা ইহাদের সুখসুবিধার কথাই ভাবিতেন এবং দেখিতেন।

**সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা।** দেশের বাকি সব লোক ছিল সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্গত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিল্পী ও চাষী —সকলেই সাধারণ শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিচিত ছিল। রাষ্ট্রে ইহাদের কোন অধিকার ছিল না; সুযোগ সুবিধাও ইহারা বড় পাইত না। উচ্চ শ্রেণীর অত্যাচারে ও দারিদ্র দুঃখে ফরাসী কৃষকদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে ইহারা ছিল অতি দরিদ্র অথচ ইহাদের উপরেই অত্যধিক করভার চাপান হইয়াছিল। করও ছিল আবার অনেক রকমের। রাজা রাজকর লইতেন, বিনা পারিশ্রমিকে রাস্তা ও বাড়িঘর তৈয়ারির কাজে ইহাদের খাটাইয়া লইতেন। চার্চকে ইহাদের ধর্মকর দিতে হইত। জমিদাররাও কৃষকদের নিকট হইতে নানাভাবে অর্থ আদায় করিত। ইহা ছাড়া সপ্তাহে ২।৩ দিন কৃষকদের বিনা পারিশ্রমিকে জমিদারের জমিতে কাজ করিয়া দিতে হইত। আবার প্রত্যেক জমিদারের শিকার খেলার জন্য নিজ নিজ এলাকায় জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের পশুপক্ষী অনেক সময় কৃষকদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিত। কিন্তু ইহাদের

মারিলে কৃষকদের কঠিন শাস্তি হইত। মোটামুটি দরিদ্র কৃষকদের শ্রমলব্ধ আয়ের পাঁচ ভাগের চারভাগই নানাবিধ কর দিতে যাইত, মাত্র এক-পঞ্চমাংশ দিয়া কায়ক্লেশে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। সুতরাং কৃষকদের জীবন যে দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিশপ, গ্রাম্য যাজক, রাজার সভাসদ, গ্রাম অঞ্চলের জমিদার, জজ, ব্যবসায়ী-ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নী এবং কৃষক দম্পতি।

শহর অঞ্চলে শিল্পী ও মজুরদের অবস্থাও ছিল প্রায় কৃষকদের মত। শিল্পীরা কাজের অভাবে জীবিকা নির্বাহের উপযোগী আয় করিতে পারিত না। তাহাদের মজুরীর হারও ছিল খুব কম। সাধারণ মজুরদের মজুরীর হারও ছিল অতি সামান্য, তাহাও আবার সব সময় জুটিত না। অভিজাতশ্রেণী অনেক সময় বিনা বেতনে তাহাদের খাটাইয়া লইত। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহারা শিক্ষিত ও ভদ্র এবং ইহাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। সর্ববিষয়ে অগ্রণী হইলেও ইহারা রাজনীতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। ইহাদের জীবিকার উপর নানাবিধ বিধি-নিষেধ

আরোপিত থাকায় ইহাদের মধ্যেও অসন্তোষ তীব্রভাবে দেখা দিয়াছিল।

**ফরাসী সাহিত্যের প্রেরণা।** এই সময় ফরাসী দেশে একদল মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা ফরাসী দেশের ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখনী ধরিয়া তীব্র কশাঘাত করিলেন এবং জন-সাধারণের অসন্তোষের আগুনে ইন্ধন যোগাইলেন। এই সকল লেখকদের মধ্যে ভলতেয়ার ও রুশোর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জন-সাধারণকে সচেতন করেন। মানুষের রচিত অন্যায় বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া মুক্তিলাভের প্রেরণা রুশো ও ভলতেয়ার পরাধীন মানুষের মনে জাগাইয়াছেন। তাঁহারা ফরাসী জনসাধারণের মনে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহার পরিণতি হইয়াছিল বিপ্লবে।

ভলতেয়ার

রুশো

**আমেরিকা ও ইংলণ্ডের প্রভাব।** আর একদিকে বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইতে ফরাসী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল আমেরিকার স্বাধীনতা সমর। আমেরিকার স্বাধীনতা সমরে ফ্রান্স আমেরিকার পক্ষ লইয়া লড়িয়াছিল। বহু ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক জর্জ ওয়াশিংটনের

নেতৃত্বে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে; আমেরিকায় স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণশক্তিকে জয়যুক্ত করিয়া গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ফরাসী জনমনের উপর আমেরিকার ঘটনাবলী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমেরিকার জনসাধারণ যাহা সম্ভব করিয়াছে, ফ্রান্সেও জনসাধারণ একত্র হইয়া দাঁড়াইলে তাহা করিতে পারে, এ ধারণা ফরাসীদের মনে বদ্ধমূল হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহাও ফরাসী জাতিকে প্রেরণা দিয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রজাশক্তি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া ফরাসীদের পথ দেখাইল, কি উপায়ে তাহারাও ইংরাজদের ন্যায় রাষ্ট্র শাসনের অধিকার লাভ করিতে পারে।

**আর্থিক দুর্গতি ও ষ্টেট্স-জেনারেল আহ্বান।** ফরাসী জনসাধারণের মনে যখন অসন্তোষের আগুন তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ষোড়শ লুই। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন ফ্রান্সের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজাদের অপরিমিত বিলাসের অর্থ যোগাইতে এবং যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছিল। নিঃস্ব কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ করিয়া আর অর্থ পাইবার উপায় ছিল না। রাজ্যের এই দুরবস্থা সত্ত্বেও ধনী অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় এক কপর্দক কর দিতে রাজী হইল না। অর্থাভাবে শাসনব্যবস্থা প্রায় অচল হইয়া পড়িল। তখন নিরুপায় হইয়া রাজা ষ্টেট্স জেনারেল বা রাষ্ট্রসভা

ষোড়শ লুই

ডাকিলেন ( ১৭৮৯ )। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের ন্যায় ফ্রান্সে ষ্টেট্স জেনারেল নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহা অভিজাত, যাজক ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইত। কিন্তু প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর রাজারা ষ্টেট্স জেনারেল ডাকেন নাই। এবার এতদিন পরে যখন ডাকা হইল তখন জনসাধারণ তাহাদের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইল।

**বিপ্লবের অগ্রগতি—জাতীয় পরিষদ গঠন।** ভার্সাই রাজপ্রাসাদে ষ্টেট্স জেনারেলের অধিবেশন বসিল। প্রাচীন নিয়ম অনুসারে যাজক, অভিজাত ও জনসাধারণের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন কক্ষে বিভক্ত হইয়া বসিলেন। দুইটি কক্ষ বা বিভাগ একমত হইলে তাহাই অধিকাংশের মত বলিয়া গ্রহণ করা হইত। এ ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মত টিকিত না; কারণ যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সর্বদা জনসাধারণের বিরুদ্ধে একমত হইয়া চলিতেন। এবারে জনসাধারণ দাবি করিল যে, সকল প্রতিনিধিরা একত্র বসিবেন এবং মাথা গুণতি ভোটে সব প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। তাঁহারা ষ্টেট্স জেনারেলকে 'জাতীয় পরিষদ' বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের একত্রে মিলিত হইবার আহ্বান জানাইলেন। অভিজাতদের পরামর্শে রাজা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিবার জন্য অধিবেশন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ গণপ্রতিনিধিরা তখন পার্শ্ববর্তী টেনিস খেলার মাঠে অধিবেশন বসাইয়া প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিবার পূর্বে তাঁহারা পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিবেন না। জনসাধারণের দৃঢ়তা দেখিয়া অগত্যা রাজা জাতীয় পরিষদকে স্বীকার করিয়া লইলেন। এইরূপে ষ্টেট্স জেনারেল জাতীয় পরিষদে পরিণত হইল।

টেনিস কোর্টে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
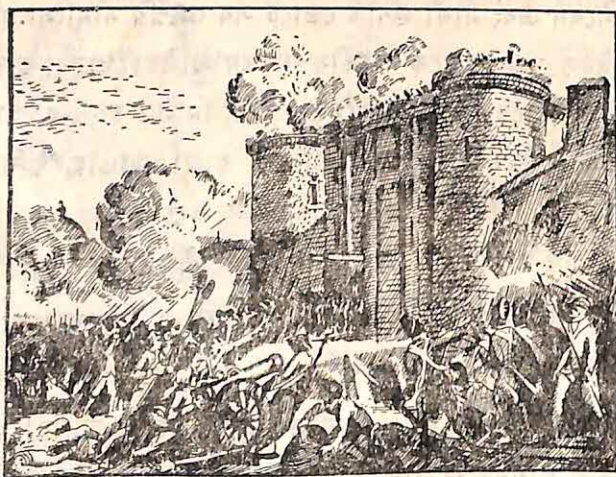
বাস্তিলের পতন

**'বাস্তিলের পতন'**। জাতীয় পরিষদে যখন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল তখন অভিজাতদের পরামর্শে রাজা পরিষদকে দমন করিতে রাজধানীর পাশে সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্যারিসের জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহী হইল এবং বাস্তিল নামক রাজ-কারাগারটিকে ধ্বংস করিয়া দিল। বাস্তিল ছিল স্বৈরাচারী রাজ-তন্ত্রের প্রতীক। ইহার অন্ধকারময় রুদ্ধ কারাকক্ষে কত নির্দোষ বন্দী বৎসরের পর বৎসর জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। বাস্তিলের পতন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ও সামন্ত-তন্ত্রের পতন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই এই ঘটনা ঘটে। আজও এই দিনটি ফ্রান্সের জাতীয় উৎসব দিবসরূপে পালিত হয়। বাস্তিল পতনের পর প্যারিসের জনসাধারণ একটি নগরসভা বা কমিউন স্থাপন করিয়া উহার হাতে শাসন কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিল এবং নাগরিকদের লইয়া একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করিল। বাস্তিল ধ্বংসের সংবাদ দাবানলের মত সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ফ্রান্সের সর্বত্র প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া জমিদারদের দুর্গপ্রাসাদ ধ্বংস করিল, দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলিল। প্যারিসের অনুকরণে অন্যান্য নগরগুলিতে জনসাধারণ নগরসভা ও জাতীয় বাহিনী স্থাপন করিয়া কর্তৃত্ব গ্রহণ করিল। বড় বড় অভিজাত জমিদারেরা পলাইয়া বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা দেশে রহিল তাহারা ভয় পাইয়া নিজেদের অধিকার স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিল।

**বিপ্লবের বিস্তার**। ইতিমধ্যে জাতীয় পরিষদ মানব অধিকারের একটি সনদ রচনা করিল। ইহা অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি বাতিল করিয়া দিল এবং উচ্চনীচ ও ধনীনির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান অধিকার দান করিল। মানব

অধিকারের সনদ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী মানুষকে শুনাইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজা ও সামন্তবর্গ জাতীয়-পরিষদের বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। এই সময় প্যারিসের নাগরিকরা খাদ্যাভাবে নিদারুণ কষ্ট পাইতেছিল। ষড়যন্ত্রের খবর পাইয়া প্যারিসের ক্ষুধার্ত নরনারী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত জনতা দল বাঁধিয়া ভার্সাইতে যাইয়া রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিল। রাজা লুই ও রাণী মারী আঁতোয়ানেৎ অতিকষ্টে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু জনতা তাঁহাদের লইয়া প্যারিসে ফিরিয়া আসিল এবং সেখানে রাজপ্রাসাদে রাজা ও রাণী প্রায় বন্দীর মত রহিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও তখন হইতে প্যারিসে হইতে লাগিল।

মারী আঁতোয়ানেৎ

**রাজার প্রাণদণ্ড—রাজতন্ত্রের পতন।** পরবর্তী দেড় বৎসর বিশেষ কোন গোলযোগ দেখা গেল না। এই সময়ের মধ্যে জাতীয়-পরিষদ নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত করিল। ফ্রান্সে ইংলণ্ডের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু লুই ইহা মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুতি দিলেও গোপনে ইহার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন এবং বিদেশী রাজাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ফরাসী-বিপ্লব বিদেশী রাজাদের মনেও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল।

তাঁহারা বিপ্লবীদের পরাজিত করিয়া ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। লুই ইঁহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য রাণী ও সন্তানদের লইয়া গোপনে প্যারিস হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ধরা পড়িলেন। উত্তেজিত জনতা তাঁহাদের রাজধানীতে লইয়া আসিল।

এতদিন বিপ্লবী জনসাধারণ লুইকে সিংহাসনে রাখিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজশাসন স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু লুইর বিশ্বাসঘাতকতায় অধিকাংশ লোক রাজার প্রতি আস্থা হারাইল। তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা চরমপন্থী জ্যাকোবিন দলের হাতে গেল। ইহারা রাজতন্ত্রের বিলোপ-সাধন করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিল। সুযোগও আসিয়া গেল।

এতদিন ইউরোপের রাজন্যবর্গ ফ্রান্সের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। এবার রাজার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া একযোগে ফ্রান্স আক্রমণ করিল এবং পরপর কয়েকটি যুদ্ধে ফরাসীবাহিনীকে পরাজিত করিল। এই সংবাদ পাইয়া উত্তেজিত জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া রাখিল এবং রাজভক্ত শত শত নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করিল। এদিকে দেশপ্রেমিক ফরাসীরা দলে দলে সৈন্যদলে যোগ দিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। এই সময় ফরাসীদের বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মার্সাই' রচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় সংগীত ফরাসীদের মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। দেশপ্রেমে বলীয়ান ফরাসী সৈন্যের আক্রমণে শত্রুসৈন্য ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বিপ্লব জয়যুক্ত হইল।

ইতিমধ্যে জাতীয়-পরিষদের কার্যকাল শেষ হইল এবং একটি নূতন পরিষদ নির্বাচিত হইল। এই পরিষদ রাজতন্ত্র লোপ করিয়া

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। তারপর দেশদ্রোহিতার অপরাধে রাজার বিচার হইল। বিচারে রাজার প্রাণদণ্ড হইল। গিলোটিন নামক যন্ত্রে রাজার মুণ্ডচ্ছেদ করা হইল।
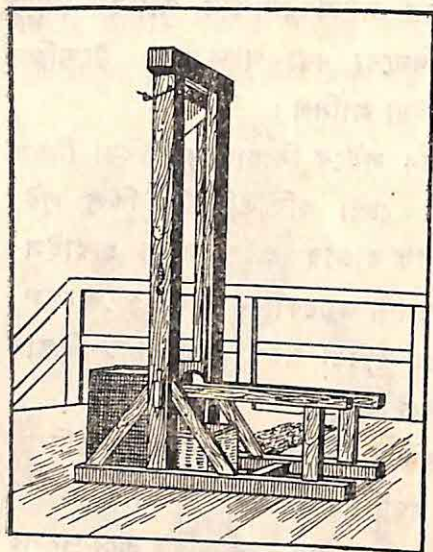
'গিলোটিন'-যন্ত্র

**ইউরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ—বিভীষিকার রাজত্ব।** ষোড়শ লুইয়ের হত্যার ফলে সমগ্র ইউরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। এদিকে প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স ঘোষণা করিল যে, রাজাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যেখানেই জনগণ বিদ্রোহ করিবে সেখানেই ফরাসীরা তাহাদের সাহায্য করিবে। ইহাতে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লব প্রসারলাভ করিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি দেশ সংঘবদ্ধ হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও গোলযোগ দেখা দিল। একটি অঞ্চলে রাজভক্ত লোকেরা বিদ্রোহ করিল। বিপদের কালোমেঘ চারিদিক হইতে ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল। ইহার ফলে প্যারিসে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। রাষ্ট্রের এই সমূহ আপৎকালে চরমপন্থী জ্যাকোবিন দল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিকে সরাইয়া দিয়া নিজেদের হাতে কর্তৃত্ব লইল। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ, দেশের ভিতরে

বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা প্রজাতন্ত্রের সমর্থক দলের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিল। জ্যাকোবিনরা ক্ষমতা হাতে লইয়া ছোট একটি সমিতির হাতে সমস্ত শাসনভার ন্যস্ত করিল। এই সমিতির নায়ক হইলেন রোবেস্পিয়ের। বিশ্বাসঘাতকদের কার্য-কলাপ নিবারণ এবং অন্তর্বিরোধ দূর করিবার জন্য তিনি এক নূতন আইন করিয়া সামান্য সন্দেহবশেই প্রতিদিন দলে দলে লোককে মৃত্যুদণ্ড দিতে লাগিলেন। রাণী এবং রাজপক্ষীয় বহুলোক ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। এই সময় সন্দেহবশে কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতাকেও বধ করা হইল। এক-মাত্র প্যারিসেই আড়াই হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হইল এবং দেশের অন্যান্য স্থানে কমপক্ষে দশ হাজার লোক প্রাণ হারাইল। ফরাসী ইতিহাসে ইহা "বিভীষিকার রাজত্ব" বলিয়া খ্যাত।

রোবেস্পিয়ের

ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সকল প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এদিকে রোবেস্পিয়ের যুদ্ধের আয়োজনও সম্পূর্ণ করিলেন। কয়েক লক্ষ ফরাসী সৈন্যকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। স্থলযুদ্ধে সর্বত্র ফরাসীরা জয়লাভ করিল। ইংলণ্ড ব্যতীত আর সকল দেশ ফরাসীদের সহিত সন্ধি করিল। এই যুদ্ধবিগ্রহের সময়েই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নেপোলিয়নের অভ্যুদয় ঘটে।

নেপোলিয়ন

বিভীষিকার রাজত্ব নয় মাস চলিয়াছিল। বিদেশী শত্রুদের পরাজয়ের পরে দেশের বিপদ যখন কাটিয়া গেল তখন বিভীষিকার রাজত্বের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রোবেস্পিয়ের ক্ষমতা হারাইয়া ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। শাসনক্ষমতা আবার নরমপন্থীদের হাতে গেল। কিন্তু ইহারা সুষ্ঠুভাবে শাসন-কার্য ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিতে পারিল না। দেশে আবার গোলোযোগ দেখা দিল। তখন ফরাসী সেনা-বাহিনীর একজন তরুণ সৈন্যাধ্যক্ষ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্থাপিত করিলেন। তিনি ফরাসীদেশে একনায়ক শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন ; কিন্তু বিপ্লব-যুগে যে সকল অধিকার জনসাধারণ লাভ করিয়াছিল তাহা বহু পরিমাণে রক্ষা করেন এবং বহু জনহিতকর আইন প্রবর্তন করিয়া বিপ্লবের আদর্শকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

**ফলাফল।** ফরাসী-বিপ্লব বর্তমান যুগের ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মধ্যযুগের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এবং রীতি-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ফরাসী-বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। ইহার ফলে স্বৈরাচারী রাজশাসন, ও অভিজাত ও যাজকমণ্ডলীর বিশেষ অধিকার বিনষ্ট হইয়া গেল। ইহার স্থানে দেখা দিল জনসাধারণের রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ও সাম্য। ফরাসী দেশে গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত হইল, মানুষে-মানুষে অধিকারের বৈষম্য দূর হইল। পুরাতন যুগের অবসান ঘটিল। নূতন যুগ, নূতন ভাবধারা লইয়া দেখা দিল ; মানুষের মন নূতন আশায় ভরিয়া উঠিল। ফরাসী দেশে যখন বিপ্লব সুরু হইয়াছিল তখন ফ্রান্সের বাহিরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা একইরূপ ছিল। সেখানেও

জনসাধারণ নিপীড়িত হইত, তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। ফরাসী-বিপ্লবের বাণী তাহাদের অন্তরেও নূতন আশার সঞ্চার করিল। তাই বিপ্লবের আদর্শ অন্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িল এবং সর্বত্রই দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল। ফরাসী-বিপ্লবের ফলে ইতিহাসের ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইল।

## কালপঞ্জী

ষোড়শ লুই—১৭৭৪—'৯৩

ষ্টেট্স জেনারেলের অধিবেশন—বিপ্লবের সূচনা—১৭৮৯ (৫ই মে)

বাস্তিলের পতন—(১৪ই জুলাই, ১৭৮৯)

মানব-অধিকারের সনদ—১৭৮৯

রাজার প্রাণদণ্ড—১৭৯৩

বিভীষিকার রাজত্ব—১৭৯৩—১৭৯৪ (প্রায় নয় মাস)

নেপোলিয়নের শাসনকাল—(১৭৯৯—১৮১৫)

সম্রাট পদবী গ্রহণ—১৮০৪

( ৮ )

## শিল্প-বিপ্লব

**বর্তমান সভ্যতার উৎস।** বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দু'টি প্রধান ঘটনা হইল ফরাসী-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব। ফরাসী-বিপ্লব সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং রাষ্ট্র শাসনে জনসাধারণের চরম অধিকার স্থাপিত করিয়া গণতন্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছিল। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইউরোপে অতি নিঃশব্দে আর একটি বড় বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল এবং ইহার ফলও অতি ব্যাপকভাবে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের জীবনে দেখা দিয়াছিল। এ বিপ্লব প্রথম ইংলণ্ডে সুরু হয় এবং কালক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ। শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতি, মানুষের জীবনধারা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল এবং ধীরে ধীরে মানুষের অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনের রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল।

**ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রাধান্য।** পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা মহাদেশ এবং ইউরোপ হইতে প্রাচ্যদেশে আসিবার সমুদ্র পথ আবিষ্কৃত হয়। ইহার ফলে ইউরোপীয় দেশ-সমুহের সহিত বহির্বিশ্বের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ইউরোপের আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত দেশ সমূহ ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পদশালী হইয়া উঠিল। এই সকল দেশের মধ্যে ইংলণ্ড প্রথম প্রাধান্য লাভ করিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের ফলে ইংলণ্ডের বণিক ও ব্যবসায়ীদের হাতে প্রভূত অর্থ আসিয়া জমা হইতে লাগিল। এই অর্থ তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য খাটাইতে আরম্ভ করিল। মধ্যযুগে শিল্পীরা নিজ নিজ নিগমের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীন ভাবে শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করিত। কিন্তু বহির্বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে একদল নূতন বিত্তশালী বণিকের উদ্ভব হইল। ইহারা নিজেরা সরাসরি কোন দ্রব্য উৎপাদন করিত না। কিন্তু ইহারা নিজেদের অর্থ দ্বারা কাঁচা মাল কিনিয়া শিল্পীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত। শিল্পীরা নিজ নিজ কুটিরে বসিয়া নিজেদের যন্ত্রপাতি দ্বারা স্ত্রী ও সন্তানদের সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করিত। যাহাকে যতটা দ্রব্য উৎপাদন করিতে দেওয়া হইত, সে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ফরমাইস অনুসারে বড় বড় ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করিত। ব্যবসায়ীরা এই সকল দ্রব্য দেশবিদেশে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় শিল্পীরা তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিল এবং ক্রমে ক্রমে বড় বড় ব্যবসায়ীদের অধীনে শ্রমিক হইয়া দাঁড়াইল এবং সর্বতোভাবে তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল। শিল্পজাতদ্রব্য উৎপাদন-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন আসিতেছিল তাহা শিল্প-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও কলকারখানা স্থাপিত হইবার ফলে আরও দ্রুত ও ব্যাপক হইয়া দেখা দিল।

**বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন।** অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্তও ইংলণ্ড প্রধানতঃ কৃষি প্রধান দেশ ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যভাগে বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগের ফলে ইংলণ্ডের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসিল এবং

কৃষিপ্রধান ইংলণ্ড সহসা শিল্প প্রধান দেশে পরিণত হইল। এই পরিবর্তন শিল্প-বিপ্লব নামে খ্যাত।

**কৃষি-শিল্প।** বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সর্বত্র ইংলণ্ড-জাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেল এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। তখন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন যাহার ফলে অল্প সময়ে এবং অল্পলোকের সাহায্যে বহু পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইল। প্রথম পরিবর্তন আসিল কৃষিশিল্পে। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে চাষের প্রথায় আমূল পরিবর্তন আসিল এবং ইংলণ্ডের কৃষি সম্পদ অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পাইল। জেথ্রোটাল নামক এক ব্যক্তি ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে অল্প সময়ে বহুপরিমাণ জমিতে বীজ বপন করা সম্ভব হইল। আবার মধ্যযুগে ইংলণ্ডে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় পুরাতন যন্ত্রপাতি দ্বারা চাষ-বাস হইত। সাধারণতঃ একখণ্ড জমি হইতে পর পর দুই বৎসর ফসল তুলিয়া তৃতীয় বৎসর তাহাতে আর চাষ করা হইত না। এই পন্থায় জমির উর্বরতা রক্ষা করা হইত। এই প্রথায় দেশের সব জমি একসঙ্গে চাষে আনা হইত না। লর্ড টাউনসেণ্ড হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, আগাছা রোপণ ও শস্যবীজের পর্যায়াবর্তন দ্বারা জমির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যায়। তারপর নানারূপ নূতন সারের ব্যবহার আবিষ্কৃত হইল। তখন চাষে পুরাতন প্রথার পরিবর্তে নূতন প্রথা গ্রহণ করা হইল এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে কৃষকদের আর জমি পতিত রাখিবার প্রয়োজন হইত না। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পতিত ও পশুচারণ জমি উদ্ধার করিয়া কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করা হইল।

এই সময় বেকওয়েল ও কোলিং নামক দুই ব্যক্তির চেষ্টায় গবাদি পশুর বংশের উৎকর্ষ বিধানের জন্য নানা পন্থা উদ্ভাবন করা হইল। ইহার ফলে গরু, মহিষ ও মেষের ওজন অনেক বৃদ্ধি পাইল এবং এই সকল জীবজন্তুর কার্য করিবার শক্তিও বৃদ্ধি পাইল। এই সকল পরিবর্তনের ফলে ইংলণ্ডের কৃষি সম্পদ বৃদ্ধি পাইলেও সাধারণ চাষীদের অবস্থা শোচনীয় হইল। দরিদ্র চাষীদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনিয়া জমি চাষ করা সম্ভব ছিলনা। তাহাদের জমিও ছিল ছোট ছোট, অর্থের জোরও ছিলনা। সুতরাং তাহারা নগদ টাকা লইয়া নিজেদের জমি বিক্রয় করিয়া দিল এবং দিন মজুরে পরিণত হইল। অর্থশালী লোকেরা কৃষকদের জমি কিনিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা মজুর খাটাইয়া চাষ করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে ইংলণ্ডে বড় বড় জোতদার শ্রেণীর উদ্ভব হইল।

**বয়নশিল্প।** কৃষিশিল্প ছাড়া বয়নশিল্প ও লৌহ শিল্পেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে বিপ্লব আসিয়াছিল। জন কে নামক এক ব্যক্তি একপ্রকার মাকু তৈয়ার করেন; হারগ্রীভস্, আর্করাইট ও ক্রম্পটন সূতাকাটার যন্ত্রের উদ্ভাবন ও উন্নতি বিধান করেন এবং কার্টরাইট উন্নত প্রণালীর বস্ত্রবয়ন-যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। এই সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে বস্ত্র বয়ন শিল্পে যুগান্তর ঘটিল। এখন হইতে যন্ত্রের সাহায্যে অল্প শ্রমে, সস্তায় ও অতি দ্রুতগতিতে প্রচুর বস্ত্র উৎপাদিত হইতে লাগিল।

**লৌহশিল্প ও মৃৎশিল্প।** রোবাক, কোর্ট ও ডার্বি প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টার ফলে লৌহ শিল্পেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। পূর্বে কাঠ কয়লা দিয়া লোহা গালান হইত। এখন এই প্রথার পরিবর্তন করিয়া পাথুরে কয়লার ব্যবহার প্রচলিত করা হইল। কাঠ কয়লার সরবরাহ অপ্রচুর ছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের খনিগুলিতে
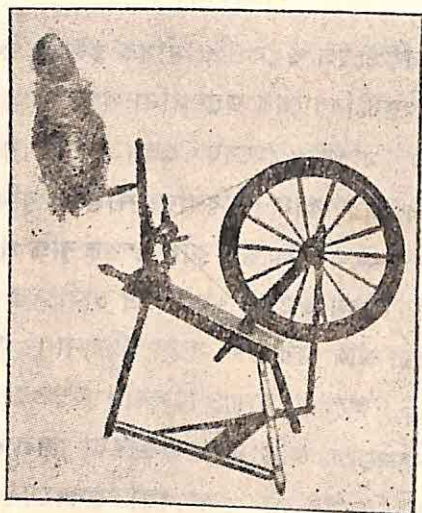
পুরাতন একটি সূতা কাটা যন্ত্র
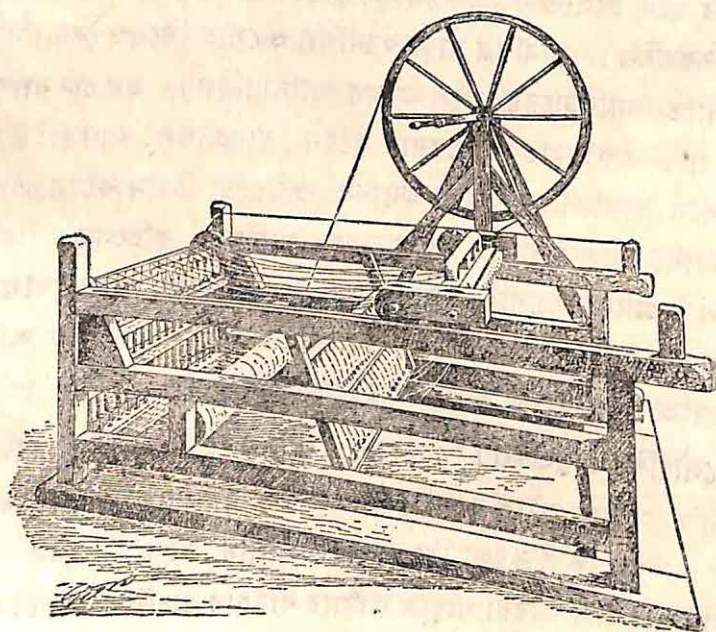
হারগ্রাভ্‌সের উদ্ভাবিত সূতা কাটার যন্ত্র 'স্পিনিং জেনি'
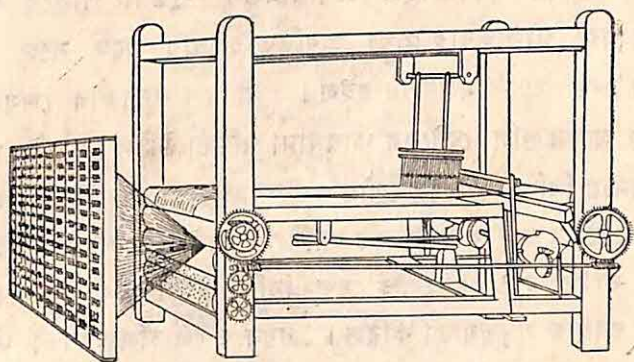
কার্টরাইটের বয়ন যন্ত্র
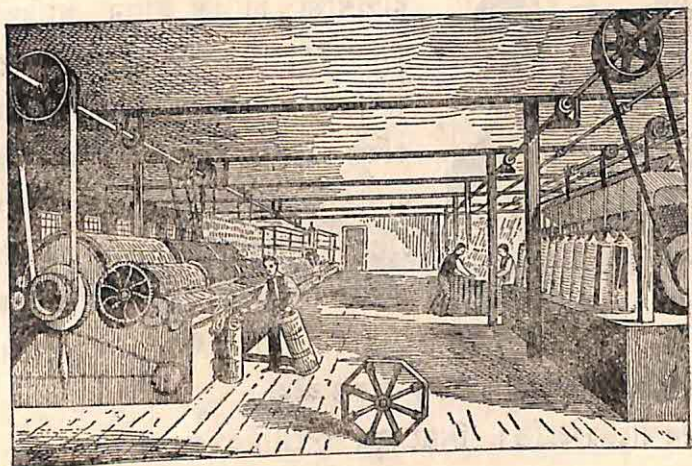
১৭৯০ সালের একটি বস্ত্র বয়ন কারখানা

পাথুরে কয়লার সঞ্চার ছিল অপরিমিত। সুতরাং পাথুরে কয়লা দ্বারা লোহা গালাইবার প্রথা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লৌহ শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে অনেকগুলি লৌহের কারখানা গড়িয়া উঠিল। এই সকল কারখানায় বিবিধ প্রকার লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য তৈয়ার হইয়া দেশ-বিদেশের অভাব মিটাইতে লাগিল। এই শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই ইংলণ্ডের প্রথম লৌহ সেতু নির্মিত হইল এবং প্রথম লৌহ নির্মিত জাহাজ সমুদ্রযাত্রা করিল। বয়ন ও লৌহশিল্প ছাড়া এযুগে মৃৎশিল্পেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হয়।

**বাষ্পশক্তির প্রয়োগ**। এযুগের আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা কলকারখানায় বাষ্পশক্তির ব্যবহার। জেমস ওয়াট নামক একজন বৈজ্ঞানিক বাষ্পশক্তি চালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করিয়া ইহা সম্ভব করিলেন। শিল্পক্ষেত্রে বাষ্পশক্তির প্রয়োগ যান্ত্রিক যুগের সূচনা করিল। সমস্ত কারখানাগুলি তখন বাষ্পশক্তি চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে চলিতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাষ্পীয়পোত ও রেল ইঞ্জিন তৈয়ার করা হইল এবং দেশের অভ্যন্তরে রেলগাড়ির চলাচল আরম্ভ হইল।

জেমস ওয়াট

**পথ-ঘাটের উন্নতি**। শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলন হইবার ফলে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হইল এবং দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়া গেল। এদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া গেল। সুতরাং
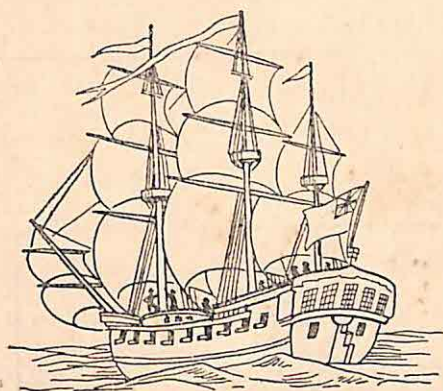
পালতোলা জাহাজ
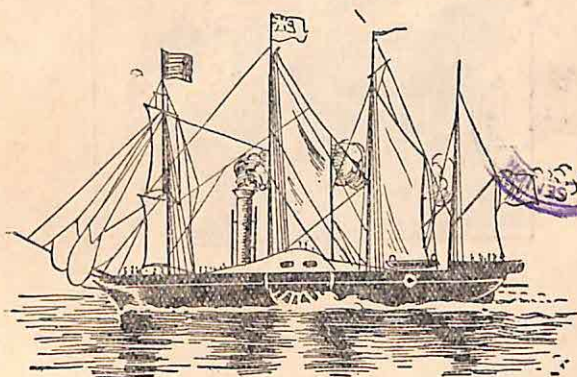
'দি গ্রেট ওয়েস্টার্ণ'

প্রথম বাষ্পীয় পোতের একখানি 'দি গ্রেট ওয়েস্টার্ণ, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ১৫ দিনে ব্রিস্টল হইতে নিউইয়র্কে পৌছাইয়াছিল।
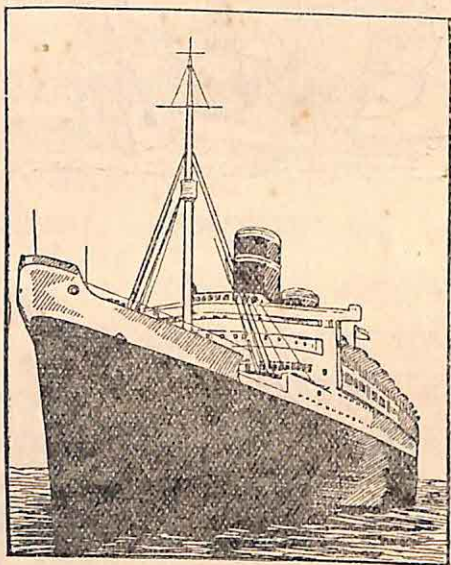
আধুনিক জাহাজ

এই সকল দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশের বাজারে প্রেরণের সমস্যা বড় হইয়া দেখা দিল। দেশের মধ্যে মালপত্র একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরবরাহ করিবার জন্য জন ম্যাকাডাম আলকাতরা ও পাথরের টুকরা মিলাইয়া উন্নত প্রণালীতে পথঘাট তৈয়ার করিবার প্রথা আবিষ্কার করিলেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বড় বড় রাস্তা নির্মিত হইল এবং বহু খাল খনন করা হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নদী ও সমুদ্রগামী ষ্টিমার বা বাষ্পীয়পোত নির্মিত হইল (১৮০৭)।
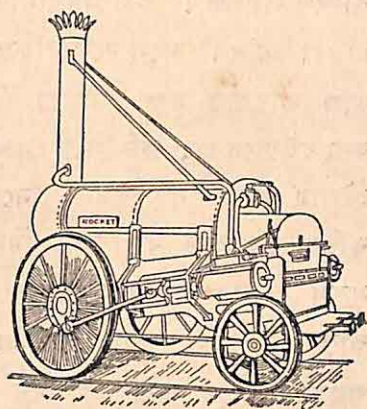
স্টিফেনসন নির্মিত রেল ইঞ্জিন 'রকেট'

স্টিফেনসন এই সময়ে (১৮১৪) তাঁহার প্রথম রেল ইঞ্জিন নির্মাণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত দেশে রেলপথ বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং বাষ্পীয়পোতের সাহায্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়া দূর দূর দেশে মালপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। এই সকল উন্নতির ফলে ইংলণ্ড এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইল।

স্টিফেনসন

**অতিকায় কারখানা—ধনিক ও শ্রমিক।** শিল্প-বিপ্লবের ফলে কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া দেশে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত

হইল এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া গেল। উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলকারখানাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বড় বড় শহর গড়িয়া উঠিল। দলে দলে দরিদ্র গ্রামবাসীরা শহরের কারখানায় কাজ করিবার জন্য আসিয়া জমা হইতে লাগিল। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিশিল্পে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলন হইবার ফলে বহু কৃষক নিজেদের ছোট ছোট জোত বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়া দিন মজুরে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল বেকার চাষীরা অন্নের সংস্থানের জন্য কারখানার মালিকদের কাছে উপস্থিত হইল। এদিকে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অল্পশ্রমে প্রচুর দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় মজুরের প্রয়োজন কমিয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া কারখানার মালিকরা অল্প মজুরীতে ইহাদের কারখানায় বেশি খাটাইয়া প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর কারখানাগুলিতে মজুরদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটিতে হইত। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যাও ছিল অনেক। এরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সামান্য যাহা রোজগার হইত তাহাতে দুবেলা পেট ভরিয়া খাওয়াও তাহাদের জুটিত না। আবার কারখানার কাছেই ছোট ছোট অন্ধকার, নোংরা ঘরে মজুর পরিবারগুলিকে বাস করিতে হইত। দীর্ঘকাল পরিশ্রম, খাদ্যাভাব এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করিবার ফলে মজুরদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, রোগে আক্রান্ত হইয়া দলে দলে তাহারা মরিতে লাগিল। মজুর শ্রেণীর দুঃখদুর্দশা একেবারে চরমে উঠিল। কোন প্রতিকার তাহাদের হাতে ছিল না। মালিকদের সর্তে অল্প মজুরীতে কাজ না করিলে উপবাস করিয়া মরিতে হইবে। মালিকরা মজুরদের সুখ-দুঃখের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা করিল না। তাহারা শুধু

লাভের অঙ্ক লইয়াই মাতিয়া রহিল। নূতন ব্যবস্থায় দেশের সম্পদরাশি মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে আসিয়া জমিতে লাগিল। একদল অর্থশালী হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত হইতে লাগিল; আর একদল, যাহারা দেশের শতকরা নিরানব্বুই ভাগ, তাহারা উত্তরোত্তর দরিদ্র হইতে লাগিল। সমাজে দুইটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর উদ্ভব হইল এবং ধনিক ও শ্রমিকদের স্বার্থের সংঘাত আসিল। ইহার ফলে, শিল্প-প্রধান দেশগুলির সমাজে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিল। প্রথমে গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশা দূর করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। পরে নানাবিধ কারখানা আইন ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর আংশিক রাষ্ট্র কর্তৃত্ব স্থাপিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই ত্রুটি অনেক পরিমাণে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

শিল্প-বিপ্লব এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ প্রকৃতির উপর বহু পরিমাণে আপন কর্তৃত্ব স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

## কালপঞ্জী

**কৃষিশিল্প**

জেথোটালের বীজ বপনযন্ত্র—১৭০১

লর্ড টাউনসেণ্ডের আবিষ্কার১৭৩১-৩৮

বেকওয়েল—১৭২৫-৯৫

**বয়ন-শিল্প**

কে—১৭৩৩

হারগ্রীভস্—১৭৬৫

আর্করাইট—১৭৬৪

ক্রম্পটন—১৭৭৯

কার্টরাইট—১৭৮৫

**বাষ্পশক্তি**

জেমস্ ওয়াট—১৭৬৯

স্টিফেনসনের প্রথম রেল ইঞ্জিন—১৮১৪

প্রথম বাষ্পীয় পোত 'ক্লারমণ্ট'—১৮০৭

---

## ইটালী ও জার্মানীর ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভ

### (ক) ইটালী

**ফরাসী-বিপ্লবের প্রেরণা** উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইটালী ছিল পরাধীন, বিচ্ছিন্ন ও বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত। জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য এবং আচার-ব্যবহার এক হইলেও ইটালীয়ানদের মধ্যে জাতীয় একতা গড়িয়া উঠে নাই।

ফরাসী-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। প্রত্যেক পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করিবে, ইহা ছিল ফরাসী-বিপ্লবের একটি বড় আদর্শ। এই আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের দুইটি বিভক্ত ও দুর্বল জাতি ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া দুইটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। এই রাজ্য দুইটির নাম ইটালী ও জার্মানী। প্রকৃতপক্ষে ফরাসী-বিপ্লবের এই আদর্শ সমস্ত বিশ্বে ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

নেপোলিয়ন যখন ইটালী জয় করিলেন তখন তিনি কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সেখানে ফরাসী দেশের ন্যায় উদার শাসনব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সময় ফরাসী-বিপ্লবের ভাবধারা ইটালীর জনগণের মনে এক অভূতপূর্ব সাড়া আনিয়াছিল। তাহারা তখন হইতে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইটালী স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় মাতিয়া উঠিল।

কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয় ও পতনের পরে ইটালীয়ানদের স্বাধীন ইটালী স্থাপনের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। ইউরোপীয় রাজ-

নীতিবিদগণ পূর্বের ন্যায় ইটালীকে আবার কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। মোটামুটি নূতন ব্যবস্থায় প্রায় সমস্ত ইটালীকে ভাগ করিয়া অস্ট্রিয়ার অনুগত বিদেশী রাজাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল এবং ইহারা সর্বত্র স্বেচ্ছাচারী শাসন স্থাপিত করিলেন। একমাত্র উত্তর ইটালীর পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া রাজ্যে একটি ইটালীয়ান রাজবংশ রাজত্ব করিতেন।

**স্বাধীনতা আন্দোলন—ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুর।** এই নূতন ব্যবস্থা স্বাধীনতাকামী ইটালীয়ানরা মানিয়া লইতে চাহিল না। তাহারা গুপ্ত সমিতি গড়িল, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিল। ইটালীর রাজারা অস্ট্রিয়ার সাহায্যে বার বার বিদ্রোহ দমন করিলেন।

কিন্তু ইটালীর সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ইটালীতে তিনজন অসাধারণ স্বদেশ প্রেমিক নেতার আবির্ভাব ঘটিল। ইহাদের নাম ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুর। ম্যাট্‌সিনির প্রেরণা, গ্যারিবল্ডির সমর কুশলতা ও কাভুরের কূট-নীতি—এই তিনের মিলনে ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

ম্যাটসিনি

জাতীয়তাবাদের ঋষি ম্যাটসিনি প্রথম জীবনে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন। তারপর কারাগার হইতে বাহির হইয়া তিনি 'যুব-ইটালী' নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া দেশের যুব শক্তিকে সংঘবদ্ধ করিলেন। তাঁহার প্রেরণায়

ইটালীর যুবকরা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখবরণ, এমক কি জীবন দানের ব্রত গ্রহণ করিল। তাহারা দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অসম সাহসী ও সমর কুশল গ্যারিবল্ডি ম্যাট্‌সিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত দেশে আসিল নব জাগরণের সাড়া। রাজশক্তি আঘাত হানিল; বহু বীর যুবক রাজরোষে কারাবরণ করিল, প্রাণ দিল।

গ্যারিবল্ডি

ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বিদেশ হইতেই তাঁহারা মুক্তি আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন।

গ্যারিবল্ডি সার্ডিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি ইটালীকে স্বাধীন করিবার ব্রত গ্রহণ করেন এবং এজন্য বহু দুঃখ বরণ করেন। শুধু নিজের দেশের স্বাধীনতাই তাঁহার কাম্য ছিল না; দেশ-বিদেশ যেখানেই মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া মুক্ত হইতে চাহিয়াছে, সেখানেই তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার জাতিগুলি যখন স্পেনের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে তখন গ্যারিবল্ডি সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন।

**কাভুরের রাজনীতি।** ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ভেনিস ও লম্বার্ডি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা

করিল। এই সময় পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কাভুর। তাঁহার লক্ষ্য ছিল পীডমণ্ট রাজবংশের নেতৃত্বে ইটালীয়ান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া স্বাধীন ইটালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। এজন্য তিনি পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া রাজ্যটিকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যখন উত্তর ইটালীতে বিদ্রোহ সুরু হইল তখন কাভুরের উপদেশে সার্ডিনিয়ার রাজা বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি এবং ইটালীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে স্বাধীনতাকামী জনগণ দলে দলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করিল। কাভুরের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি রোম জয় করিয়া সেখানে একটি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপিত করিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই অস্ট্রিয়া ও ফরাসী সৈন্যের আক্রমণের ফলে গ্যারিবল্ডি ও ম্যাট্‌সিনি আবার দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

কাভুর

**অস্ট্রিয়ার পরাজয় ও ইটালীর স্বাধীনতা লাভ।** এই যুদ্ধের পরে কাভুর বুঝিতে পারিলেন যে, কেবলমাত্র সার্ডিনিয়ার সামরিক বল এবং ইটালীর জাগ্রত জাতীয় চেতনার উপর নির্ভর করিলে শক্তিশালী অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া দেশের স্বাধীনতা আনা যাইবে না। তখন তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসীদের সহায়তা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাশিয়ার সহিত ইংরাজ ও ফরাসীদের যুদ্ধ বাধিল। কাভুর এই যুদ্ধে ইংরাজ ও

ফরাসীদের সাহায্য করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সার্ডিনিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। ফরাসী সৈন্য তাহাদের সহিত যোগ দিল। যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হইল এবং উত্তর ইটালীর এক অংশ সার্ডিনিয়াকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিল। ইহার পর মধ্য ইটালীতে বিপ্লব আরম্ভ হইল। স্বেচ্ছাচারী রাজারা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুসারে মধ্য ইটালীর রাজ্যসমূহ সার্ডিনিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। অর্ধেক ইটালী স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হইল।

কিন্তু এই যুদ্ধের সময়ে ইটালীয়ানদের মধ্যে যে জাতীয় উদ্দীপনা জাগিয়াছিল তাহার গতিরোধ হইল না। দেখিতে দেখিতে সিসিলিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। কাভুরের গোপন সম্মতি লইয়া গ্যারিবল্ডি এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য লইয়া তিনি সিসিলিতে গেলেন এবং শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার লালকোর্তা পরিহিত সৈন্যের সম্মুখে নেপল্‌সের রাজকীয় সৈন্যদল দাঁড়াইতে পারিল না। বারবার পরাজিত হইয়া তাহারা সিসিলি ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তড়িৎ-গতিতে সিসিলি জয় সমাপ্ত করিয়া গ্যারিবল্ডি সসৈন্যে দক্ষিণ ইটালীর নেপলস রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভয়ে নেপলসের রাজা রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। নেপল্‌স ও সিসিলির যুক্তরাজ্য গ্যারিরল্ডির হাতে আসিল। ইতিমধ্যে কাভুর ও সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল নেপল্‌সে উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডি রাজার হাতে বিজিত রাজ্য সমর্পণ করিয়া বিদায় নিলেন। রোম ও ভেনিস ছাড়া ইটালীর আর সমস্ত অংশ স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভিক্টর ইমানুয়েলকে ইটালীর রাজা বলিয়া ঘোষণা

করা হইল। এইরূপে স্বাধীনতাকামী ইটালীয়ানদের স্বপ্ন সফল হইল। এই ঘটনার কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভেনিস ও রোম স্বাধীন ইটালী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

## (খ) জার্মানী

ভাষা, সাহিত্য ও জীবনধারা এক হইলেও ইটালীর ন্যায় জার্মানীও ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত। এখানে ছোটবড় অনেকগুলি রাজ্য ছিল। এই সব রাজ্যগুলি লইয়া একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার রাজা ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের অধিকর্তা। এখানেও ইটালীর ন্যায় সমস্ত দেশের উপর ছিল অস্ট্রিয়ার আধিপত্য।

**জাতীয়তাবোধের উন্মেষ।** ফরাসী-বিপ্লবের যুগে নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে বিপ্লবের ভাবধারা এখানে ছড়াইয়া যায়। এই সময় নেপোলিয়নের হাতে জার্মান জাতিকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। পরাজয় ও অপমানের গ্লানি জাতির মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করিল। জার্মানরা বুঝিতে পারিল, জাতি যতদিন বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন থাকিবে ততদিন দেশকে বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত করা যাইবে না। তখন সমস্ত জাতির মধ্যে আসিল নব জাগরণের সাড়া, নূতন উদ্দীপনা। সর্বত্র জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। জাতীয়তাবাদী জার্মানরা নেপোলিয়নকে পরাস্ত করিল। এই যুদ্ধকালে জার্মানীর একটি রাজ্য প্রাশিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরেও জার্মান জাতির জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আশা পূর্ণ হইল না। ইউরোপের রাজনীতিবিদরা ইটালীর ন্যায় জার্মানীকেও বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ইহাতে জার্মান জাতি হতাশ হইল না। জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য তাহারা তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিল। প্রাশিয়ার একদল

সাহিত্যিক ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শ সমস্ত দেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন জার্মান রাজ্যে বারবার প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিল, কিন্তু অস্ট্রিয়ার চেষ্টায় বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল ; জার্মানীর জাতীয় ঐক্য আন্দোলন সফল হইল না।

**বিসমার্কের আবির্ভাব।** উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাশিয়াতে অতি বিচক্ষণ ও প্রতিভা-শালী একজন রাজনীতিকের আবির্ভাব হইল। ইঁহার নাম ছিল বিসমার্ক। তিনি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কর্মশক্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। তিনি ১৮৬২ সালে প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হইয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমস্ত জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি শক্তিশালী জার্মান রাজ্যগঠনে অগ্রসর হইলেন। তখন হইতে আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়া গেল। বিসমার্ক ছিলেন খুব জবরদস্ত রাজনীতিক। তিনি গণতন্ত্র, গণভোট প্রভৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, বড় বড় সমস্যাগুলির সমাধান বক্তৃতা বা ভোটের জোরে হয় না ; মীমাংসা হয় অস্ত্রের জোরে, আর রক্তপাতে। এজন্য তিনি প্রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সংকল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন।

বিসমার্ক

**অস্ট্রিয়ার পরাজয়—ঐক্যের পথে।** বিসমার্ক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জার্মানীর মুক্তি ও ঐক্য লাভের পথে অস্ট্রিয়াই সর্বপ্রধান

বাধা এবং জার্মানী হইতে তখন অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য লোপ করিতে না পারিলে সাফল্য আসিবে না। সুতরাং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য বুঝিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন এবং রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিলেন। বিসমার্কের কূটনীতির ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রে যখন অস্ট্রিয়া একক হইয়া পড়িল তখন বিসমার্ক নিশ্চিন্তমনে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সাত সপ্তাহের মধ্যেই অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া জার্মানীকে নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। উত্তর জার্মানীর কতগুলি রাষ্ট্র লইয়া নূতন একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইল এবং প্রাশিয়ার রাজা হইলেন ইহার প্রেসিডেন্ট। বিসমার্কের চেষ্টায় অর্ধেক জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইল। এবার দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলিকে উত্তর জার্মানীর সহিত মিলিত করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের কার্যে বিসমার্ক আত্মনিয়োগ করিলেন।

**ফ্রান্সের পরাজয়—ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভ।** বিসমার্কের হাতে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ভীত হইলেন। এতকাল ফ্রান্স ছিল ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। বিচ্ছিন্ন জার্মানী যদি একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাজ্য হয় তাহা হইলে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য লোপ পাইবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া ফ্রান্স নানাভাবে বিসমার্কের চেষ্টায় বাধা দিতে লাগিল। বিসমার্ক বুঝিলেন যে, ফ্রান্সকে যুদ্ধে পরাজিত না করিতে পারিলে সমগ্র জার্মানীর ঐক্য কখনও আসিবে না। এজন্য তিনি নিঃশব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধে ফ্রান্স যাহাতে অন্য কোনও শক্তির সাহায্য না পায় এজন্য তিনি অতি সতর্কতার সহিত অন্যান্য রাজ্যের সহিত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মিত্রতা স্থাপন করিলেন। প্রথমেই তিনি অস্ট্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অস্ট্রিয়ার

মনোভাব প্রাশিয়ার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। বিসমার্ক যুদ্ধের পরে অস্ট্রিয়ার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করিলেন যে, অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার বন্ধু হইয়া গেল। ফ্রান্স গোপনে অস্ট্রিয়াকে নিজের দলে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু বিসমার্কের চালে ইহা ব্যর্থ হইল। রাশিয়া ইতিপূর্বেই প্রাশিয়ার বন্ধু হইয়াছিল। ইংলণ্ডও ফ্রান্সের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। সুতরাং প্রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইহারা কেহ ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিবে না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, বিসমার্ক কূটনীতি প্রয়োগে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধাইতে অগ্রসর হইলেন। বিসমার্ক এমন চাল দিলেন যে, ফ্রান্সই আগাইয়া আসিয়া প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সকলেই মনে করিল নির্দোষ ও নিরীহ প্রাশিয়াকে ধ্বংস করিবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ বাধাইয়াছেন। যুদ্ধে জার্মান সৈন্য সহজেই ফ্রান্সকে পরাজিত করিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন আত্মসমর্পণ করিলেন। বিজয়ী জার্মান সৈন্য প্যারিস দখল করিল। ভার্সাইর রাজপ্রাসাদে প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়মকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নূতন জার্মানী জন্মলাভ করিল। প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হইবার পর মাত্র আট বৎসরের মধ্যেই, একক বিসমার্কের কূটনৈতিক প্রতিভাবলে জার্মানীর জাতীয় ঐক্য সাফল্য লাভ করিল। এজন্য বিসমার্ককে নব্য জার্মানীর স্রষ্টা বলা হয়।

### কালপঞ্জী

ম্যাট্‌সিনি—১৮০৫—১৮৭২
গ্যারিবল্ডি—১৮০৭—১৮৮২
কাভুর—১৮১০—১৮৬১
যুব ইটালীদল—১৮৩১
স্বাধীনতা লাভ—১৮৬১

বিসমার্ক—১৮১৫—১৮৯৮
অস্ট্রিয়ার পরাজয়—১৮৬৬
ফ্রান্সের পরাজয়—১৮৭০
জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা—১৮৭১

## আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথার বিলোপ

ক্রীতদাস-প্রথা যে কত প্রাচীন তাহা বলা সম্ভব নয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে এ প্রথা অতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এককালে খাস ইটালীতে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস ছিল। রোমান সাম্রাজ্য পতনের পরে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবে ধীরে ধীরে ইউরোপ হইতে ক্রীতদাস-প্রথা লোপ পাইতে থাকে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্রীতদাস-প্রথা নূতন করিয়া ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিল। আমেরিকায় উপনিবেশের অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এক একজন সম্পন্ন কৃষক হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক ছিল এবং তুলা, তামাক ইত্যাদি উৎপাদন করিয়া প্রচুর আয় করিত। এত বড় খামারে চাষের কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট মজুর আমেরিকায় পাওয়া যাইত না। আবার মজুর যাহা পাওয়া যাইত তাহাদের মজুরীও খুব বেশি ছিল। কৃষিকার্যের প্রয়োজনে আমেরিকায় কদর্য দাস-প্রথা গড়িয়া উঠিল।

**দাসব্যবসা—ক্রীতদাসের জীবন।** ইউরোপের বণিক জাতিগুলি আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদের ধরিয়া আনিয়া আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের নিকট বিক্রয় করিত। ঔপনিবেশিকরা এই সকল কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের কিনিয়া চাষের কাজে লাগাইতে লাগিল। কয়েক

বৎসরের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস আমেরিকায় আমদানি করা হইল। ক্রীতদাসের ব্যবসা খুব লাভজনক হইয়া দাঁড়াইল।

ক্রীতদাসের জীবন ছিল দুঃসহ, দুঃখময়। যেভাবে তাহাদের আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় ধরিয়া আনা হইত সে কাহিনী অতি করুণ। ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায়ীরা জাহাজ লইয়া আফ্রিকায় যাইত। সেখানে উপকূল ভাগের গ্রামগুলির উপর হামলা করিয়া, আগুন লাগাইয়া স্ত্রী-পুরুষ যাহাদের হাতের কাছে পাইত ধরিয়া আনিত। তারপর জাহাজে পূরিয়া আমেরিকায় আনিয়া তাহাদের বিক্রয় করা হইত। দাস-ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ একরূপ জাহাজ তৈয়ার করা হইত। এই সব জাহাজের খোলে অনেকগুলি পাটাতন থাকিত। পাটাতনগুলিতে ঘেষাঘেষি করিয়া নিগ্রোদের শোয়াইয়া রাখা হইত। তাহাদের হাত-পা শিকলে বাঁধা থাকিত। এই অবস্থায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহাদের সমুদ্র পথে কাটিত। এই বর্বর নৃশংসতার ফলে হাজার হাজার দাস পথেই মরিয়া যাইত। তারপর যখন আমেরিকায় পৌঁছাইত তখন তাহাদের বিক্রয় করা হইত। প্রভুরাও তাহাদের সহিত অতি নির্দয় ব্যবহার করিত। চাবুক মারিয়া পশুর মত তাহাদের খাটাইয়া লওয়া হইত। ছোট ছোট ঘরের মধ্যে অনেক লোককে গাদাগাদি করিয়া রাখা হইত। অতি পরিশ্রমে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগাক্রান্ত হইয়া দলে দলে দাস মরিয়া যাইত। এমনই দুঃখে তাহাদের দিন কাটিত। অথচ আমেরিকার 'স্বাধীনতা-পত্রে' ঘোষণা করা হইয়াছিল, সব মানুষ সমান। এ কথা কৃষ্ণকায় মানুষদের সম্বন্ধে খাটিত না।

**ক্রীতদাস-প্রথা বিলোপের আন্দোলন।** আমেরিকাতেও অনেকে দাস-প্রথা অন্যায় এবং নীতি ও ধর্ম বিরোধী বলিয়া মনে করিত এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি তুলিয়াছিল। লাওএল, ব্রায়ান্ট

'টমকাকার কুটিরে' বর্ণিত ক্রীতদাসের উপর নির্যাতন।

ও লংফেলো প্রভৃতি মনীষীরা দাস-প্রথার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু দাস-প্রথার অমানুষিক নৃশংসতার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিলেন হ্যারিয়েট বীচার নামে একজন মহিলা লেখিকা। তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল ইরা' নামক একটি পত্রিকায় টমকাকা নামে পরিচিত একজন নিগ্রোদাসের জীবন ও শোচনীয় মৃত্যু কাহিনী লইয়া একটি গল্প লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। এই গল্প বাহির হইবামাত্র সমস্ত আমেরিকায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল, দাস-প্রথার অমানুষিকতা জনসাধারণের বিবেকে আঘাত করিল। ইহার পরে শ্রীমতী বীচার আরও গল্প রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন। সব গল্প লইয়া 'টমকাকার কুটির' নামে একটি বই বাহির হইল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনূদিত হইয়া ইহা সর্বত্র প্রচারিত হইল। তখন দাস-প্রথার বিরুদ্ধে একটি বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইতিপূর্বেই দাস-প্রথার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেখানে দাস-ব্যবসা ও দাস-প্রথা আইন করিয়া রহিত করা হইল। পৃথিবীর সুসভ্য জাতিগুলির মধ্যে ইংরাজরাই ছিল এ বিষয়ে অগ্রণী। ইংলণ্ডের দেখাদেখি অনেক দেশে এমন কি আমেরিকাতেও স্থানে স্থানে দাস-ব্যবসা বে-আইনি করা হইল। দাস-ব্যবসা বে-আইনি করা হইলেও আমেরিকায় দাস-প্রথা বজায় রহিল, অর্থাৎ যে সকল অঞ্চলে পুরাতন আমল হইতে দাস ছিল তাহারা দাসই রহিল, মুক্তি পাইল না। চাষের কাজ এই সকল দাসের দ্বারাই চালান হইতে লাগিল।

**যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ।** উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাস-প্রথা উপলক্ষ করিয়া আমেরিকায় উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্য (উপনিবেশ) গুলির মধ্যে গৃহযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি ছিল শিল্পপ্রধান। ব্যবসা-বাণিজ্য

ছিল এ অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা স্বাধীন মজুর নিয়োগ করিয়া কাজ চালাইত। দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলি ছিল কৃষি-প্রধান। ইহারা দাসমজুর নিয়োগ করিত। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি আইন করিয়া দাস-প্রথা উচ্ছেদ করিয়াছিল কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে ইহা অবাধে চলিতেছিল। দাস-প্রথার অমানুষিকতা উপলব্ধি করিয়া উত্তরাঞ্চল সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে দাস-প্রথার উচ্ছেদ দাবি করিয়া আন্দোলন চালাইতেছিল। এই কারণে উভয় অঞ্চলের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিল এবং দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র হইতে পৃথক হইয়া একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল।

**গৃহযুদ্ধ—আব্রাহাম লিংকন।** ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন। তিনি ছিলেন উত্তরাঞ্চলের লোক এবং দাস-প্রথার একান্ত বিরোধী। দাস-প্রথা-বিরোধী জনমতও এই সময় আমেরিকায় খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। লিংকন প্রেসিডেণ্ট হইবার পরেই উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সংঘর্ষ অনিবার্য হইল এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলি একে একে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। ফলে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আব্রাহাম লিংকন

লিংকন কেণ্টাকি রাজ্যের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের জন্য তিনি বাল্যকালে লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পান নাই। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ছিল অদম্য। নানাবিধ কাজকর্মের

অবসরে যখনই সময় পাইতেন তখনই বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি নিজেকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন। প্রথম জীবনে তিনি একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে কেরানীর কাজ আরম্ভ করেন। তারপর কিছুকাল সৈনিক হিসাবে যুদ্ধবিগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন। পরে তিনি আইনব্যবসা আরম্ভ করিয়া রাজনীতিতে যোগ দেন। ক্রমে তিনি উন্নতি করিতে লাগিলেন এবং পর পর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ও সেনেটের সদস্য হইয়া শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দাস-প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্ন লইয়া যখন দেশে তীব্র বাদানুবাদ চলিতেছিল তখন তিনি ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং ইহার সমর্থনে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার যশ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। লিংকন ছিলেন সাধু, আদর্শনিষ্ঠ এবং অনন্যসাধারণ মনোবলের অধিকারী। তিনি দেশের স্বার্থ সর্বদা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখিতেন। লিংকন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার পর দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলি বিদ্রোহী হইল এবং যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। যুদ্ধের মধ্যে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লিংকন ক্রীতদাস-প্রথা রহিত করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। আইন হইল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ক্রীতদাস স্বাধীন নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এই ঘোষণাবলে ৪০ লক্ষ দাস মুক্তিলাভ করিল। লিংকনের জীবনে ইহাই লইল শ্রেষ্ঠতম কার্য। গৃহযুদ্ধ অবসানের পরেই বুথ নামে একজন আততায়ীর গুলিতে লিংকন নিহত হইলেন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানব দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করিতে যাইয়া এইরূপে প্রাণ হারাইলেন।

কানাডা
প্রশান্ত মহাসাগর
ওয়াশিংটন
ওরিগন
ক্যালিফোর্নিয়া
নেভাদা
আইডাহো
মন্ট্যানা
ওয়াইওমিং
ইউটা
আরিজোনা
কলোরাডো
নিউ মেক্সিকো
উ: ডাকোটা
দ: ডাকোটা
নেব্রাস্কা
কানসাস
মিনেসোটা
আয়োয়া
উইস্কন্সিন
মিশিগান
ইলিনয়
ওহায়ো
পেন্সিলভানিয়া
নিউ ইয়র্ক
ভারমণ্ট
মেইন
নিউ হ্যাম্পশায়ার
ম্যাসাচুসেটস্
রোড আয়ল্যাণ্ড
কনেক্টিকাট,
নিউ জার্সি
ডেলাওয়ার
মেরীল্যাণ্ড
মিজুরী
কেণ্টাকী
ভার্জিনিয়া
টেনেসি
উ: ক্যারোলাইনা
দ: ক্যারোলাইনা
জর্জিয়া
ফ্লোরিডা
আলাবামা
মিসিসিপি
আরকানসস্
লুইজিয়ানা
টেক্সাস
রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চল
মেক্সিকো
আটলাণ্টিক মহাসাগর
সীমান্ত রাষ্ট্র
উত্তরাঞ্চল
দক্ষিণাঞ্চল
০ ২০০ ৪০০
মাইল
আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

**দাস-প্রথা লোপ।** দক্ষিণ অঞ্চলের পরাজয়ের ফলে নিগ্রো ক্রীতদাসরা মুক্তি পাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইল এবং দেশের অখণ্ডতা রক্ষা পাইল। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেত অধিবাসীরা নিগ্রোদের মুক্তি পছন্দ করিল না ; নাগরিক হিসাবে তাহাদের সমকক্ষ বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী হইল না। তাহারা কয়েকটি গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করিয়া নিগ্রোদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। কু-ক্লাক্স্-ক্লান্ নামে আমেরিকায় একটি গুপ্ত-সমিতি আছে। নিগ্রোদের উপর ইহার অত্যাচার আজও সমানভাবে চলিতেছে। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট, নিগ্রো ও শ্বেতকায় নাগরিকদের মধ্যে এখনও যে অসাম্য ও ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে।

## কালপঞ্জী

আমেরিকায় প্রথম নিগ্রো-ক্রীতদাস আমদানি—১৬১৯

আব্রাহাম লিংকন—( ১৮০৯—১৮৬৫ )

প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত—১৮৬১—'৬৫

গৃহযুদ্ধকাল—১৮৬১—'৬৫

ক্রীতদাস-প্রথা লোপ—১৮৬৩

———

## ইউরোপীয় জাতির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার

**উপনিবেশ বিস্তার ও সাম্রাজ্য স্থাপন।** পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলম্বাস ও ভাস্কো-দা-গামা প্রভৃতি নাবিকদের ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ধীরে ধীরে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে ইউরোপীয় অধিকার ও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আবার এই যুগে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও রাশিয়া যথাক্রমে ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং উত্তর ও মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপন করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয় জাতিগুলি নূতন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন এবং বাণিজ্য বিস্তারের মধ্য দিয়া প্রায় সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিয়া বড় বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিল এবং পৃথিবীর সর্বত্র ইউরোপীয় প্রভাব ও সভ্যতা স্থাপন করিল। ইহার ফলে পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া গেল।

**উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অধিকার বিস্তারের কারণ।** সমগ্র পৃথিবীতে ইউরোপীয় অধিকার ও সভ্যতা বিস্তারের পিছনে বড় দু'টি কারণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। রেল ইঞ্জিন ও বাষ্পীয় পোত প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত করা সম্ভব হইল। ইহার ফলে ইউরোপীয় জাতিগুলির পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ অনেক সুগম হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের প্রায়

প্রত্যেক দেশে বড় বড় কল কারখানা স্থাপিত হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। এই সকল উৎপন্ন মালের কাটতি যাহাতে হয় এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার কল-কারখানাগুলি চালু রাখিবার জন্য কাঁচামালের প্রয়োজনও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই দুই কারণেই বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় জাতিগুলি উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইল। ইহারা তখন জনবহুল এশিয়া মহাদেশে অধিকার বিস্তার করিয়া সেখানকার বাজার দখল করিতে অগ্রসর হইল এবং আফ্রিকা প্রভৃতি জনবিরল মহাদেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সেই সকল স্থানের কৃষি ও খনিজ সম্পদ নিজেদের কাজে লাগাইতে লাগিল। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে যাতায়াতের পথ সুগম হওয়ায় এই কাজ সহজসাধ্য হইল।

**'শ্বেত জাতির বোঝা'।** বিগত শতাব্দীর প্রথম হইতেই ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে অনুন্নত ও দুর্বল দেশগুলিতে নিজ নিজ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ইহারা অন্যায়ভাবে দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা হরণ করিবার স্বপক্ষে যুক্তি স্বরূপ এক নূতন ধূয়া তুলিয়া বলিল যে, সমগ্র বিশ্বের অনুন্নত ও অনগ্রসর জাতিগুলিকে শিক্ষাদান করিয়া সুসভ্য ও উন্নত করিয়া তুলিবার সুমহান দায়িত্ব বিধাতা শ্বেতজাতির হাতে দিয়াছেন। ইহারই নাম হইল 'শ্বেত জাতির বোঝা।'

**লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলীর 'অন্ধকার মহাদেশ' আবিষ্কার।** উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্তও আফ্রিকা মহাদেশ ছিল বিশ্বের অন্যান্য জাতির কাছে প্রায় অপরিজ্ঞাত। ইহা সকলের কাছে শ্বাপদ-সঙ্কুল, গভীর অরণ্যময় 'অন্ধকার মহাদেশ' নামে পরিচিত ছিল। যে সকল ইউরোপীয় জাতি আফ্রিকার সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহারা ইহার

উপকূল ভাগের সম্বন্ধেই কিছু কিছু খবর রাখিত। আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েকজন দুঃসাহসিক মিশনারী এবং অভিযাত্রীর চেষ্টায় আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জনসাধারণ জানিতে পারিল। ইহাদের মধ্যে লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলীর নাম বিশেষ স্মরণীয়। লিভিংস্টোন ছিলেন স্কটল্যাণ্ডবাসী একজন ডাক্তার। তিনি লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির সহিত বর্বর জাতির মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য আফ্রিকায় যান। কয়েক বৎসর তিনি আফ্রিকায় ধর্ম প্রচার করিয়া কাটাইলেন। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল হইতে জাম্বেসী ও কঙ্গো নদীর উপত্যকা ধরিয়া পূর্বে ভারত মহাসাগরের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর তিনি ধর্ম প্রচারের কাজ ছাড়িয়া দিয়া আফ্রিকার নূতন নূতন অঞ্চল আবিষ্কারের কাজে লাগিয়া গেলেন। কয়েক বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু লিভিংস্টোনের খবর আর কেহ পাইল না। তখন 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' নামে আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের তরফ হইতে স্ট্যানলী নামে একজন সাংবাদিককে লিভিংস্টোনের খোঁজে আফ্রিকায় পাঠান
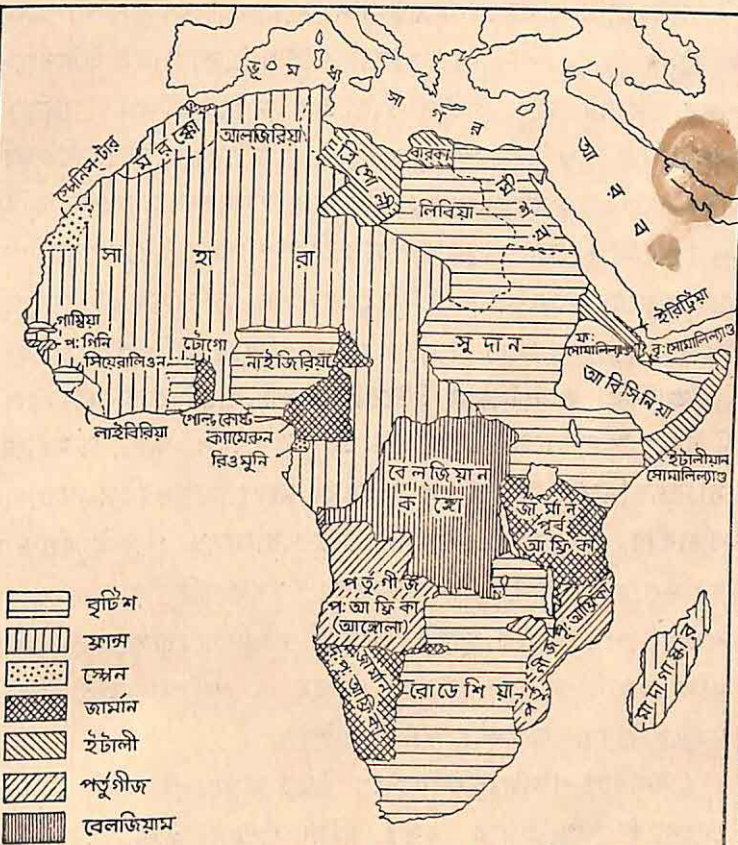
লিভিংস্টোন

স্ট্যানলী

আফ্রিকায় ইউরোপীয় শক্তিবর্গের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তার

হইল। তিনি মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বহু দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলী আফ্রিকা সম্বন্ধে কয়েকখানি মনোজ্ঞ ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ করিলেন। ইহা প্রকাশিত হইবার পর আফ্রিকা সম্বন্ধে ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে গভীর ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইল। আফ্রিকার অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদের কথা জানিতে পারিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ একে একে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করিতে অগ্রসর হইল। আফ্রিকায় অধিকার বিস্তার লইয়া ইউরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই ইহারা নিজেদের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশ ভাগাভাগি করিয়া লইল।

**আফ্রিকা ও এশিয়ায় ইউরোপীয় অধিকার বিস্তার—(১) ইংলণ্ড।** ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের যে সকল দেশ আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ইংলণ্ড ছিল সর্বপ্রধান। শতাব্দীর প্রথমভাগে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরে ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার কেপকলোনী উপনিবেশটি দখল করিয়া লয়। তারপর শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই কয়েকটি যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রায় সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে ইংরাজ অধিকার স্থাপিত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর আফ্রিকার মিশর ও সুদান দেশে ইংরাজ প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফরাসী-ইঞ্জিনীয়ার লেসেপ্‌স প্রসিদ্ধ সুয়েজখাল খনন করিয়া ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত করেন (১৮৬৯)। ইহার ফলে ইউরোপ হইতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যাতায়াতের পথ অনেক সংক্ষেপ ও সুগম হইল। ভারতে তখন ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে যাতায়াতের পথ নিরাপদ

রাখিবার জন্য ইংলণ্ড সুয়েজখালের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া মিশরে আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত হইল। ইহা কার্যে পরিণত করিবার সুযোগও শীঘ্র আসিল। মিশরে এই সময় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলিতেছিল। গোলযোগের ফলে ইংরাজের বাণিজ্য স্বার্থের ক্ষতি হইতেছে এই অজুহাতে ইংলণ্ড মিশরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাহার হাতে ছাড়িয়া দিতে মিশরের অধিপতি 'খেদিভ'কে বাধ্য করিল। ইহার পূর্বেই ইংরাজ সরকার খেদিভের নিকট হইতে সুয়েজ খালের অংশিদারি কিনিয়া লইয়াছিল। ফলে মিশরে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হইল। খেদিভ নামে মাত্র রাজা রহিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিশরীরা ইংরাজদের দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। ইহার পরে মিশরে ইংরাজ অধিকার দৃঢ়মূল হইল। মিশরের দক্ষিণে বিস্তৃত সুদান দেশটি অনেকদিন পূর্বেই মিশর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিশরের অধীনতা ছিন্ন করিয়া সুদান স্বাধীন হয়। শতাব্দীর শেষ-ভাগে মিশরের পক্ষ হইয়া ইংরাজরা সুদান জয় করিয়া লয়। এইরূপে সুদানেও ইংরাজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল।

**(২) ফ্রান্স।** অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স আবার নূতন করিয়া সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইল। প্রথমেই ফ্রান্সের দৃষ্টি উত্তর আফ্রিকার উপর পড়িল। উত্তর আফ্রিকার আল্‌জিয়ার্স দেশের জলদস্যুরা ফ্রান্সের বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করিয়াছে, এই অজুহাতে ফরাসীরা আলজিয়ার্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং দেশটিকে অধিকার করিয়া লইল। শতাব্দীর শেষার্ধে তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ফ্রান্স টিউনিশ প্রদেশটিও দখল করিয়া লইল। মিশরে

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং আমেরিকার উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তার
সাইবেরিয়া
রাশিয়া
এশিয়া
মধ্য এশিয়া
মঙ্গোলিয়া
মাঞ্চুরিয়া
কোরিয়া
জাপান
চীন
তিব্বত
ভারত
আফগানিস্থান
পারস্য
আরব
তুরস্ক
ব্রিটিশ দ্বীঃ পুঃ
জার্মানী
ফরাসী
ইতালী
পর্তুগাল
স্পেন
টিউনিস
ত্রিপোলি
আলজিরিয়ার্স
মরক্কো
রিও-ডি-ওরো
লিবিয়া
সাহারা
এংলো সুদান
আবিসিনিয়া
সোমালিল্যাণ্ড
গাম্বিয়া
(পঃ) গিনি
সিয়েরা লিওন
কেনিয়া
টাঙ্গানাইকা
(জাঃ) পূঃ আফ্রিকা
মাদাগাস্কার
(জাঃ) পঃ আফ্রিকা
দঃ আফ্রিকা সম্মেলন
ফরমোজা
হংকং (ব্রিঃ)
(আঃ) গুয়াম
ইন্দো-চীন
ফিলিপাইন দ্বীঃ পুঃ (আঃ)
নিউগিনি
অষ্ট্রেলিয়া
আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
জার্মানী
ইংলণ্ড
ফ্রান্স
হল্যাণ্ড
বেলজিয়াম
পর্তুগাল
স্পেন
ইটালী
ডেনমার্ক
জাপান
চীন
যুক্তরাষ্ট্র
রাশিয়া
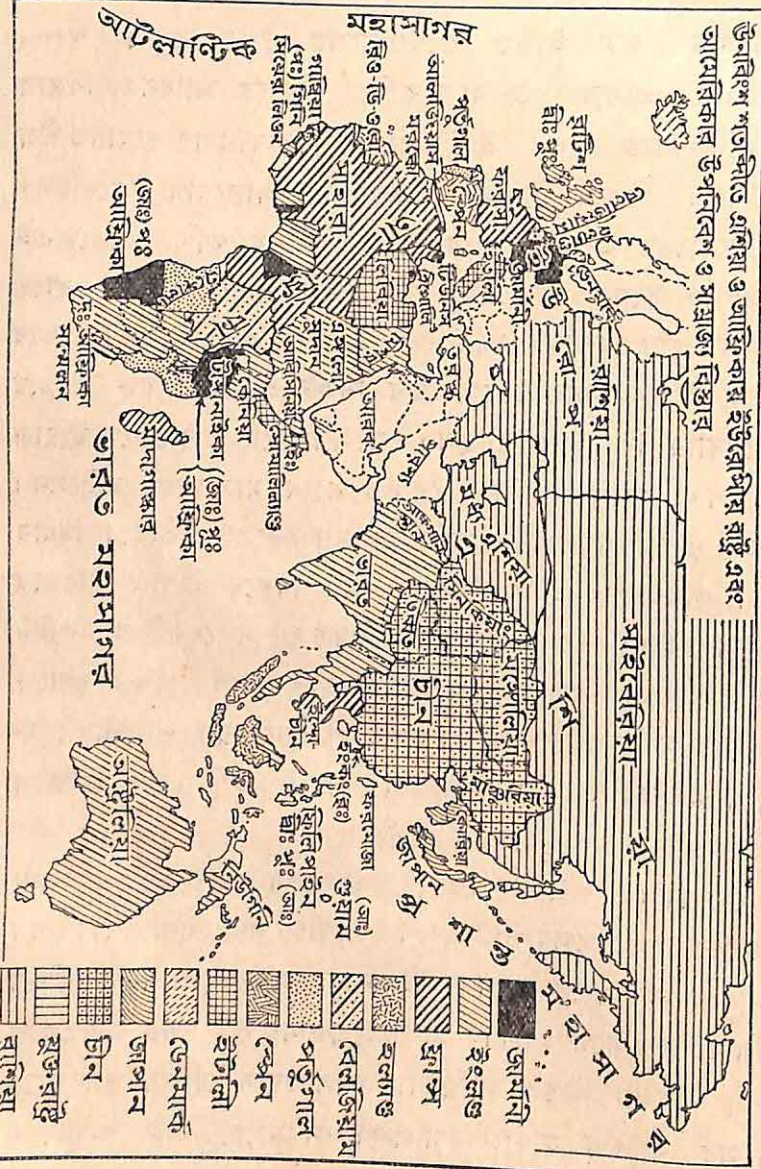
ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ায় ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে রেষারেষি দেখা দিল এবং ফরাসীরা ইংরাজদের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে একটি রফা হইল। উত্তর আফ্রিকার মরক্কো দেশে ফরাসীরা অবাধে অধিকার বিস্তার করিতে পারিবে, ইহা ইংরাজরা স্বীকার করিয়া লইল। ইহার ফলে মরক্কোর উপর ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত হইল। কালক্রমে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে সেনেগাল এবং বিস্তীর্ণ সাহারার মরু অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইন্দোচীনের আনাম, কোচিন ও কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের উপরেও ফরাসী আধিপত্য স্থাপিত হইল। এই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

**(৩) রাশিয়া।** এই শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়াও সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করিয়া এশিয়া মহাদেশের এক বিরাট অংশে অধিকার বিস্তার করিল। এতকাল রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির লক্ষ্য ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর নিজ অধিকার স্থাপন। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধিতায় তাহার এই উদ্দেশ্য সফল হইল না। ক্রিমিয়া যুদ্ধে পরাজয়ের পরে (১৮৫৬) রাশিয়ার দৃষ্টি মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার দিকে পড়িল। তখন হইতে রাশিয়া তুরস্ক ও পারস্যের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে ককেশাস অঞ্চল, মধ্য এশিয়া ও তুর্কিস্থান জয় করিয়া পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিল। সাইবেরিয়া ইতিপূর্বেই রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

আবার এই শতাব্দীতে যখন সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের নামে দুর্বল চীনকে ভাগাভাগি করিয়া লইতে

উদ্যত হইল তখন রাশিয়াও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়া পূর্ব সাইবেরিয়ায় অমুর নদীর উপত্যকা অঞ্চল দখল করিল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ব্লাডিভস্টক নামে একটি সুদৃঢ় সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত করিল। ইহার ফলে পারস্য ও তুরস্ক সীমান্ত হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর এশিয়ার উপর রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত হইল। ইহার পর রাশিয়া চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ ও পোর্ট আর্থারের উপরেও আধিপত্য স্থাপিত করিল। প্রাচ্য জগতে রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধিতে ইংলণ্ড ও জাপান শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তখন তাহারা পরস্পর মিত্রতা স্থাপন করিয়া রাশিয়াকে বাধা দিবার আয়োজন করিল। ইহার ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। রাশিয়া পরাজিত হইয়া পূর্ব এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে নিবৃত্ত হইল।

**(৪) ইটালী ও জার্মানী।** উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপে ইটালী ও জার্মানী এই দুইটি নূতন শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হইল এবং ইহারাও উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হইল। কিন্তু এই সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং নূতন শক্তি দুইটির পক্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার মতন সুবিধামত দেশ বড় ছিল না। ইহার ফলে ইটালী ও জার্মানীর সহিত অন্যান্য শক্তিগুলির রেষারেষি সুরু হইল। যখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকা ও চীন ভাগাভাগি করিয়া লইতে অগ্রসর হইল তখন জার্মানী এবং ইটালীও ইহাতে যোগ দিল। উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই ইটালী কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিল। জার্মানীও দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার এক বিস্তীর্ণ অংশ অধিকার করিয়া লইল। চীনের এক অংশেও জার্মানীর আধিপত্য স্থাপিত হইল।

এ যুগে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিও বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির অধিকারে আসিয়াছিল।

(৫) **আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র।** ইউরোপীয় শক্তিগুলির ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করে। এই শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে হাওয়াই, স্যামোয়া, গুয়াম ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার অধিকারভূক্ত হয়। বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা বিশ্বের একটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হইয়া দাঁড়াইল।

(৬) বেলজিয়াম ও পর্তুগাল। এই যুগে অন্যান্য রাজ্য যাহারা আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বেলজিয়াম ও পর্তুগালের নাম উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ কঙ্গো দেশে বেলজিয়ামের অধিকার স্থাপিত হইল এবং পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার এক অংশ পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত হইল।

**সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলাফল।** ইউরোপীয় শক্তিগুলির এই সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই সমগ্র বিশ্বের উপর ইউরোপীয় আধিপত্য ও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ইহার ফলে বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইল। ইউরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু জাতি স্বাধীনতা হারাইয়া বৈদেশিক জাতির পদানত হইল। ইহাদের অত্যাচার ও নির্বিচার শোষণ নীতির ফলে পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে জাতীয় জাগরণ দেখা দিল। ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া পরাধীন প্রাচ্য জাতিগুলি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

আর একদিকে ইউরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করিল এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করিল। শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পর সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সাম্রাজ্য বিস্তার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেই প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

## কালপঞ্জী

লিভিংস্টোন—১৮১৩-’৭৩

আফ্রিকা ভ্রমণ—১৮৫৩-’৫৬, ১৮৬৫-’৭৩

স্ট্যান্‌লী—১৮৪১-১৯০৪

স্ট্যান্‌লীর আফ্রিকা ভ্রমণ—১৮৭১-’৭২, ১৮৭৫-’৭৭

---

( ১২ )

## চীন ও জাপানের জাগরণ

**পূর্ব-এশিয়ায় ইউরোপীয় জাতির আবির্ভাব।** চীন ও জাপান বর্তমান কালে প্রাচ্য জগতের দু'টি প্রধান ও শক্তিশালী দেশ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এই দুইটি দেশই ছিল পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রায় অপরিচিত। ইহাদের কেহই পাশ্চাত্য জাতিগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে অথবা উহাদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে স্বীকৃত হয় নাই। উভয় দেশেই প্রায় একই সময় পাশ্চাত্য জাতিসমূহ জোর করিয়া প্রবেশ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। যে সকল পাশ্চাত্য জাতি চীনে জোর করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে তাহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিল ইংলণ্ড ; আর জাপানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল আমেরিকা। পাশ্চাত্য জাতি কর্তৃক চীন ও জাপানের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের কাহিনীতে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু যখন চীন ও জাপানের সহিত পাশ্চাত্য জাতির সংযোগ ঘটিল তখন হইতে এই দুইটি দেশের ইতিহাসের ধারা বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইল।

**পাশ্চাত্য জাতি কর্তৃক চীনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন।** চীনের অতুল ঐশ্বর্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বার বার চীনের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারই চীন বিদেশীদের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন চলিল না। চীনের আপত্তি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য বণিকরা ইহার উপকূল ভাগের সহিত বাণিজ্য চালাইতে লাগিল। উনবিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত

হইতে চীনে প্রচুর পরিমাণে আফিং রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিল এবং অল্পকাল মধ্যেই আফিংএর ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিল। এই ব্যবসায়ে ইংরাজদের সুবিধা হইলেও চীনের খুব ক্ষতি হইতেছিল। আফিং সেবন করিয়া চীনাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছিল ; তাহারা অলস ও শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িতেছিল। তখন চীনা সরকার চীনে আফিং আমদানি ও বিক্রয় বন্ধ করিয়া আইন জারি করিলেন। ইহাতে বিশেষ সুফল হইল না। ইংরাজ বণিকরা চীনে আফিং এর চোরাই ব্যবসা চালাইতে লাগিল। তখন চীন সম্রাটের আদেশে লিন্ নামে একজন সুদক্ষ কর্মচারী ইংরাজ বণিকদের চোরাই ব্যবসায়ের জন্য মজুত আফিং নষ্ট করিয়া দিলেন। ইংরাজরা এ সুযোগ ছাড়িল না ; তাহারা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহা প্রথম আফিম যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধে চীন পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সন্ধির সর্ত অনুসারে চীনের পাঁচটি বন্দরে বিদেশীদের বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হইল ; ইংলণ্ড হংকং দ্বীপ ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেক অর্থ লাভ করিল। বিদেশী বণিকদের উপর হইতে অনেক বিধি-নিষেধ তুলিয়া লওয়া হইল। ইহার পরেই ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেশ চীনে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিল।

**পাশ্চাত্য জাতি কর্তৃক চীন গ্রাসের চেষ্টা।** বিদেশী জাতিগুলির হাতে চীনের লাঞ্ছনা এবার ভাল করিয়া সুরু হইল। যুদ্ধের ফলে চীনের অসহায় অবস্থা সমস্ত বিশ্বের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন ইউরোপীয় বণিকদের লোভ আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা দুর্বল চীনকে চাপ দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের নূতন নূতন সুবিধা আদায় করিয়া লইতে বদ্ধপরিকর হইল। প্রথম যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি বিবাদের অজুহাতে ইংলণ্ড চীনের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্স সুযোগ বুঝিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগ

দিল। যুদ্ধে চীন পুনরায় পরাজিত হইয়া ইউরোপীয়দের আর এক দফা বাণিজ্য সংক্রান্ত সুবিধা দিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একটি বিশেষ সুবিধা আদায় করিয়া লইল। স্থির হইল, ইংরাজ ও ফরাসীরা চীনে বসবাস করিলেও চীনা আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে না ; অপরাধ করিলে নিজ নিজ দেশের আইন অনুসারে তাহাদের বিচার হইবে। ইহাতে চীনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইল। এইরূপে শক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতি একরূপ গায়ের জোরেই চীনে প্রবেশ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিল। ক্ষতি হইলেও দুর্বল চীন ইহা রোধ করিতে পারিল না।

দুই দুইবার চীনকে পরাজিত করিয়া ইউরোপীয় জাতিগুলির লোভ দুর্নিবার হইয়া উঠিল। তখন বাণিজ্যের সুবিধা লইয়া ইহারা আর সন্তুষ্ট রহিল না। ইহারা দুর্বল চীনকে ভাগাভাগি করিয়া লইবার কল্পনায় মাতিয়া উঠল এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও রাশিয়া একরূপ জোর করিয়াই চীনের কয়েকটি প্রদেশ দখল করিয়া লইল।

**চীন-জাপান যুদ্ধ।** চীনের দুর্ভাগ্য এখানেই শেষ হইল না। ইতিমধ্যে জাপান পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও রণনীতি গ্রহণ করিয়া খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিল। এবারে জাপানও চীনের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সহিত হাত মিলাইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে চীন পরাজিত হইয়া জাপানকে বাণিজ্য-সংক্রান্ত সুবিধা এবং খাস চীনের অন্তর্গত একটা ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। পাশ্চাত্য জাতিগুলিও চীনের এই অসহায় অবস্থায় সুযোগ লইতে ছাড়িল না। ইহারা চীনকে চাপ দিয়া ইজারার নামে চীনের নূতন নূতন প্রদেশ দখল করিয়া বসিল, ইহার ফলে বিশাল চীন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

**চীনের জাগরণ।** ক্ষুদ্র জাপানের হাতে পরাজয়ের অপমান এবং ইউরোপীয় জাতিগুলি কর্তৃক চীনকে ভাগাভাগি করিয়া লইবার প্রচেষ্টা চীনাদের আতঙ্কিত করিল। ইহার ফলে চীনে নব জাগরণের সূত্রপাত হইল। চীনারা বুঝিতে পারিল যে, জাপানের ন্যায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রণনীতি গ্রহণ করিতে পারিলে তাহারা নিজেদের এ অসহায় অবস্থা হইতে বাঁচাইতে পারিবে। চারিদিকে তখন সংস্কারের দাবি উঠিল। সম্রাট কোয়াংসু ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া চীনকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার জন্য সংস্কার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে চীনের একদল দেশপ্রেমিক অধিবাসী পাশ্চাত্য দস্যুদের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য গুপ্তসমিতি স্থাপিত করিয়াছিল। এই সমিতির নেতৃত্বে পাশ্চাত্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং জাপান সমবেত হইয়া চীনাদের পরাজিত করিল। পাশ্চাত্য জাতির সকল অন্যায় অধিকার ও দাবি চীন মানিয়া লইতে বাধ্য হইল।

**প্রজাতন্ত্রস্থাপন—সান্-ইয়াৎ-সেন।** বিদেশী শত্রুকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা বার্থ হইবার ফলে চীনে গভীর নৈরাশ্য দেখা দিল এবং সংস্কারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জাপান যখন শক্তিশালী রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিল তখন চীন সম্যক বুঝিতে পারিল যে, জাপানের পথ অনুসরণ করিয়াই দেশকে রক্ষা করা সম্ভব। তখন ব্যাপক সংস্কার নীতি গ্রহণ করিয়া শিক্ষা, শাসন, সৈন্যবিভাগ প্রভৃতি পাশ্চাত্য আদর্শে পুনর্গঠন করা হইল। দলে দলে যুবক শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরিত হইল। এই সময় আবার বিদেশী মাঞ্চু রাজবংশের বিলোপ সাধন করিয়া চীনে একটি

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইহার নেতা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন। ১৯১১ সালে চীনে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিল এবং পর বৎসর দক্ষিণ চীনে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটিল। সান্-ইয়াৎ-সেন চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি হইলেন।

ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন

**চীনে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ।** সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পরেই চীনকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। এই সময় সমস্ত দেশ রাজনৈতিক দলাদলিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর চীনে বহু সামরিকনেতা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসিলেন এবং প্রজাতন্ত্রী সরকারের অধীনতা মানিতে রাজী হইলেন না। জাপান ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সুবিধার জন্য ইহাদের গোপনে উৎসাহ দিতে লাগিল। নূতন সরকার এই দলাদলি দূর করিয়া, বিদেশীদের অন্যায় অধিকার লোপ করিয়া এবং দেশের শত্রু জাপানীদের দূর করিয়া দিয়া চীনে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের উদ্যোগ করিল।

**চীনে জাপানী প্রভাব বিস্তার।** চীন সরকার এই সকল দুরূহ সমস্যার মীমাংসা লইয়া যখন ব্যস্ত ছিল তখন ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং সমস্ত বিশ্বে তাহা ছড়াইয়া পড়িল। জাপান অবিলম্বে জার্মানী ও আস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যোগ দিল এবং অতর্কিত আক্রমণ করিয়া চীনের একটি অঞ্চল দখল করিয়া লইল। চীন জাপানের কার্যে প্রতিবাদ করিল, কিন্তু

কোন রাষ্ট্রই ইহাতে কর্ণপাত করিল না। ইতিমধ্যে চীনও যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিল। যুদ্ধের পরে যখন শান্তি স্থাপনের জন্য বৈঠক বসিল তখন চীন রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের নিকট পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবি জানাইল। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় নেতৃবর্গ চীনের দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। চীন নিরাশ হইয়া বৈঠক হইতে ফিরিল।

এই সময় জাপান কর্তৃক প্ররোচিত স্ব স্ব প্রধান সামরিক নেতাদের কলহের ফলে চীনে গুরুতর অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। সান-ইয়াৎ-সেন এই অরাজকতা ও আত্মকলহ হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়া এই কার্যে তাঁহাকে অকুণ্ঠ সাহায্য দিতেছিল। এই সময় চীনের বহু শিক্ষিত অধিবাসী কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারাও দেশকে বাঁচাইবার জন্য সান্-ইয়াৎ-সেনের পশ্চাতে দাঁড়াইল। সান্-ইয়াৎ-সেন ও তাঁহার পরিচালিত কুয়ো-মিং-টাং বা জাতীয়দল দেশের শাসন পরিচালনায় তিনটি মূল সূত্র গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির স্বাধীনতা ও সমান অধিকার থাকিবে এবং চীনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করিবে; দ্বিতীয়তঃ শাসন পরিচালনায় জনসাধারণের পূর্ণ অধিকার থাকিবে এবং তৃতীয়তঃ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকা অর্জনের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

**চিয়াং-কাই-শেক ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে বিরোধ।** কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের অরাজকতা দূর করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বেই এই মহান নেতার মৃত্যু হইল (১৯২৫)। সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চীনের সর্বাধিনায়ক হইলেন চিয়াং-কাই-শেক। বিদ্রোহী সামরিক নেতাদের ও বিরোধী পক্ষগুলিকে একে একে উচ্ছেদ করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ

করিলেন। একার্যে যখন তিনি প্রায় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তখন আবার নূতন বাধা দেখা দিল। সান্-ইয়াৎ-সেন দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতা ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। দেশের কমিউনিস্টরাও তখন তাঁহার জাতীয় দলে যোগ দিয়াছিল। সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর কুয়ো-মিং-টাং বা জাতীয়দলের সভ্যদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। অনেকেই কমিউনিস্টদের মত ও পথ পছন্দ করিল না। সুতরাং দলে ভাঙ্গন দেখা দিল। চিয়াং ইহাদের সহিত যোগ দিয়া কমিউনিস্টদের দল হইতে বাহির করিয়া দিলেন। কমিউনিস্টরাও প্রবল ভাবে তাহার বিরোধিতা করিতে লাগিল। চিয়াং অস্ত্রবলে যে ঐক্য আনিয়াছিলেন তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল—দেশের সর্বত্র আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

চিয়াং-কাই-শেক

চীন-জাপান বিরোধ। এদিকে জাপান চীনের শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় দলের মধ্যে বিভেদ আসিবার ফলে যখন দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল তখন জাপান ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মাঞ্চুরিয়া হইতে চীনকে বিতাড়িত করিয়া জাপান ইহাকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিল। এই রাজ্যের নাম হইল মাঞ্চুকুয়ো। আসলে ইহা হইল জাপানের তাঁবেদার রাজ্য। চীনেরা বার বার পরাজিত হইয়াও সর্বস্ব বিসর্জনের

পণ লইয়া অসীম সাহসের সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল।

১৯৩৭ সালে জাপান বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া চীনের উপর চরম আঘাত হানিল। বিজয়ী জাপানী সৈন্যের নির্মম অত্যাচারে চীন দমিল না, কাহারও মনে হতাশা আসিল না। চীনাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত চীনে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। দেশের এই দুর্দিনে কমিউনিস্টরা চিয়াংএর সহিত যোগ দিয়া জাপানের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। জাপানের অগ্রগমন প্রতিহত হইল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল। জাপান জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। চীন তখন ইঙ্গ-আমেরিকার পক্ষে যোগ দিল। যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করায় চীন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া পৃথিবীর একটি সর্ববৃহৎ শক্তির মধ্যে পরিগণিত হইল।

**জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজ।** উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চীনের ন্যায় জাপানও বাহিরের জগতের সহিত কোন সংযোগ স্থাপন করতে স্বীকৃত হয় নাই।

এই সময় জাপানের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক— মধ্যযুগে ইউরোপে যেরূপ দেখা যাইত অনেকটা সেই রকম। জাপানের সম্রাটদের উপাধি ছিল মিকাডো। জাপানীরা তাঁহাদের দেব বংশ-জাত বলিয়া মনে করে।

সম্রাটরা নামে মাত্র রাজা ছিলেন। রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা তখন ছিল মন্ত্রীদের হাতে। ইঁহাদের বলা হইত 'শোগান'। প্রায় সাত শত বৎসর পর্যন্ত শোগানরাই ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত প্রভু। সামন্তরা ছিলেন বড় বড় জমিদারির মালিক। সমাজে ইঁহারাই ছিলেন

সকলের উপরে। ইহারা দাইমিও নামে পরিচিত ছিলেন। সামন্ত জমিদার ছাড়া প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়দের ন্যায় জাপানে সামুরাই নামে একটি সামরিক শ্রেণী ছিল। সামন্ত এবং সামুরাইরা নিজ নিজ এলাকায় একরূপ স্বাধীন ভাবেই চলিতেন। চাষী ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের ইহাদের হাতে অনেক সময় নির্যাতন সহ্য করিতে হইত।

মেইজি যুগের মিকাডো মুৎসুহিতো

**পাশ্চাত্য জাতির জাপানে প্রবেশ।** উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য জাতি জোর করিয়া জাপানে প্রবেশ করিল। এই কার্যে আমেরিকা ছিল অগ্রণী। চীন ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা জাপানে ঘাঁটি স্থাপন বাকরির প্রয়োজন অনুভব করিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নৌ-সৈনাধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল পেরী জাপানে আসিলেন। আমেরিকার জাহাজের জন্য জাপানের বন্দর যাহাতে উন্মুক্ত করা হয়

সামুরাই

এই দাবি জানাইয়া তিনি সেবার চলিয়া গেলেন। পর বৎসর এক রণতরীর বহর লইয়া তিনি জাপানে আসিলেন। শোগান ভয় পাইয়া দু'টি বন্দর আমেরিকার ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দিলেন। ইহার পর দেখিতে দেখিতে অন্যান্য কয়েকটি ইউরোপীয় জাতিও জাপানের নিকট হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা এবং অন্যান্য অধিকার আদায় করিয়া লইল। চীনের ন্যায় জাপানের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল।

**জাপানের অভ্যুত্থান—পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ।** বিদেশীদের প্রভাব বিস্তারে ভীত হইয়া জাপানের কয়েকজন সামন্ত ইহাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বিদেশীরা রণতরী হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া জাপানের দু'টি শহর ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এই পরাজয়ের ফলে জাপানীরা বুঝিতে পারিল বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান এবং উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাশ্চাত্য জাতির সম্মুখে জাপান কখনও দাঁড়াইতে পারিবে না। সুতরাং দেশ ও জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, রণনীতি ও সভ্যতায় শক্তিমান হইতে হইবে। তখন জাপানে এক বিপ্লব দেখা দিল। প্রাচীন শাসন ও সমাজব্যবস্থা লোপ পাইল। শোগান পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাটের হাতে ক্ষমতা গেল। ইহার অল্পকাল পরেই সামন্তপ্রথাও উঠিয়া গেল; কৃষকরা জমির মালিক হইল, জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হইল। জাপানের এই সংস্কার আন্দোলন 'মেইজি' বা 'পুনঃ প্রতিষ্ঠা' নামে খ্যাত।

এবার জাপানে এক নব যুগের সূচনা হইল। জাপানী তরুণদের দলে দলে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান হইল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রণনীতি শিক্ষার নিমিত্ত। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিয়া দেখিতে দেখিতে জাপান পৃথিবীর একটি প্রগতিশীল ও

শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইল। তিরিশ বৎসরের মধ্যে জাপানে যে পরিবর্তন আসিল তাহা সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করিল।

**জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তার।** পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়া জাপান পাশ্চাত্য জাতির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিও গ্রহণ করিল। জাপান তখন দুর্বল চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য বস্তারে অগ্রসর হইল। প্রথমেই কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানের দৃষ্টি পড়িল। বহুকাল হইতেই কোরিয়া ছিল চীনের অধীন রাজ্য। কিন্তু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার উপর প্রভুত্ব দাবি করিয়া জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জাপানের সেনা এবং নৌবাহিনীর সম্মুখে চীন দাঁড়াইতে পারিল না, সহজেই পরাজিত হইল। সন্ধির সর্তে কোরিয়াকে স্বাধীনদেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে জাপানের প্রভাবাধীন হইল। ইহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে এক অংশ জাপানের হাতে আসিল। কিন্তু এই অঞ্চলের উপর রাশিয়ার লোভ ছিল। এজন্য রাশিয়ার চাপে জাপান ইহা চীনকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু জাপানীদের মনে এই অপমানের আগুন জ্বলিতে লাগিল। জাপান রাশিয়ার সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

**রুশ-জাপান যুদ্ধ।** চীন-জাপান যুদ্ধের পরেই পাশ্চাত্য শক্তিগুলি দুর্বল চীনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহারা একে একে চীনের কয়েকটি প্রদেশ দখল করিয়া লইল। এই সুযোগে রাশিয়া ধীরে ধীরে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে ভীত হইয়া জাপান রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে বলিল। রাশিয়া জাপানের দাবি অগ্রাহ্য করায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল (১৯০৪)। এই যুদ্ধে জলে ও স্থলে রাশিয়া সম্পূর্ণরূপে

জাপানের নিকট পরাজিত হইল। মাঞ্চুরিয়ায় জাপান ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা আদায় করিয়া লইল। ইহার পাঁচ বৎসর পরে কোরিয়া সম্পূর্ণরূপে জাপানের হাতে গেল। রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া জাপানের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গেল এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলি জাপানকে সমকক্ষ শক্তি বলিয়া মানিয়া লইল।

**জাপান কর্তৃক চীনে অধিকার বিস্তার।** ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতেই জাপান মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া চীনে অবস্থিত জার্মান অঞ্চল দখল করিয়া লইল। ইহার অল্পকাল পরেই জাপান চীনকে তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করিবার আয়োজন করিল। আমেরিকার প্রতিবাদে জাপানের এ উদ্দেশ্য পূরাপূরি সফল হইল না। যুদ্ধান্তে ভার্সাই সন্ধি বৈঠকে চীন পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল ; কিন্তু জাপানের বিরোধিতায় চীনের দাবি উপেক্ষিত হইল।

**জাপানের পরাজয়।** ভার্সাই সন্ধি বৈঠক হইতে চীনের প্রতিনিধি ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে সমস্ত চীনে জাপানের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিল এবং চীনারা জাপানী দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিল। ইহাতে জাপানের ভীষণ আর্থিক ক্ষতি হইতে লাগিল। চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হার্ডিং ওয়াশিংটনে একটি বৈঠক আহ্বান করিলেন। আমেরিকা, চীন ও জাপান ব্যতীত আরও ছয়টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র ইহাতে যোগ দিল। অনেক আলোচনার পর শক্তিগুলি প্রতিশ্রুতি দিল যে, তাহারা সকলে চীনের ভৌমিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা মানিয়া চলিবে। ইহা ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। কিন্তু ইহার পরেও চীন-জাপানের বিরোধ একেবারে মিটিল না। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আবার চীন-জাপান যুদ্ধ স্রুরু হইল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিল। চীনের পরস্পর

বিরোধী দলগুলি নিজেদের বিবাদ ভুলিয়া জাতির পরম শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে একত্র হইয়া দাঁড়াইল এবং সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধকালে জাপান পূর্ব এশিয়ার বহুদেশ জয় করিয়া লইল। কিন্তু কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর জাপান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। এই পরাজয়ের ফলে চীন রক্ষা পাইল এবং জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

কালপঞ্জী

ইংলণ্ডের সহিত চীনের প্রথম যুদ্ধ—১৮৩৯—'৪২

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ—১৮৫৭—'৫৮

তিয়েন সিনের সন্ধি—১৮৬১

পাশ্চাত্য জাতি কর্তৃক চীনে
বাণিজ্য ও প্রভুত্ব বিস্তার—১৮৬০—'৯৫

পেরীর জাপানে আগমন—১৮৫৩, ১৮৫৪

জাপানের অভ্যুদয়—১৮৬৭

চীন-জাপান যুদ্ধ—১৮৯৪—'৯৫

রুশ-জাপান যুদ্ধ—১৯০৪—'০৫

চীন বিপ্লব ও মাঞ্চুরাজ বংশের পতন—১৯১১—১৯১২
( সান্-ইয়াৎ-সেনের অভ্যুদয় )

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—১৯১৪

সান্-ইয়াৎ-সেন—১৮৬৭—১৯২৫

চিয়াং-কাই-শেক কর্তৃক নেতৃত্বগ্রহণ—১৯২৫

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া গ্রাস—১৯৩১

জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ—১৯৩৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—১৯৩৯

জাপানের পরাজয়—১৯৪৫

# রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠন

**বর্ত্তমান রাশিয়া।** ইউরোপ মহাদেশে আয়তনে রাশিয়া সবচেয়ে বড় দেশ ইউরোপ ও এশিয়ার এক বিরাট অংশ জুড়িয়া ইহা বিস্তৃত। বর্তমান কালে ইহা কোন কোন বিষয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশ। শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিরা এদেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমস্ত অসাম্য দূর করিয়া রাশিয়ার অধিবাসীরা এক শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অতি বিস্ময়কর উন্নতিসাধন করিয়া রাশিয়া পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সুসভ্য দেশে পরিণত হইয়াছে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা দিন দিন আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। অথচ বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্তও রাশিয়া ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনুন্নত, অশিক্ষিত ও অনগ্রসর।

রাশিয়ার এই অত্যাশ্চর্য উন্নতির মূলে রহিয়াছে ১৯১৭ সালে অনুষ্ঠিত বিপ্লব। ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ফলাফলের দিক হইতে বিচার করিলে এই বিপ্লব ফরাসী-বিপ্লবের সহিত তুলনীয়। ফরাসী-বিপ্লব ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের জন্ম দিয়াছে ; আর রাশিয়ার বিপ্লব সাম্যবাদের আদর্শকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া পৃথিবীতে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে। উভয় বিপ্লবের ফলেই মানব সভ্যতার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে।

**সাম্যবাদের উদ্ভব।** উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এক নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ইহা সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ

উত্তর মহাসাগর
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র
লেনা নং
লেনিনগ্রাড
মস্কো
ওরেনবার্গ
তুর্কীস্তান
আলমা আটা
সমরকন্দ
ইর্কুটস্ক
চিটা
মঙ্গোলিয়া
চীন
মাইল
0 500

ইউ. এস্. এস্. আর.

নামে প্রসিদ্ধ। জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাবীর কার্লমার্ক্স এই মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বহুকাল ইংলণ্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন এবং সেখান হইতেই তিনি নিজের মতবাদ প্রচার করেন। তিনি সাম্যবাদের যে বিশিষ্ট রূপ দিয়াছেন তাহা বর্তমানে কমিউনিজম নামে পরিচিত।

কার্লমার্ক্স

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের জনসমাজ মোটামুটি দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—একটি ধনিক ও অপরটি শ্রমিক। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কলকারখানার মালিক হইয়া প্রতি দেশেই ধনিক শ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে লইয়া দেশের সমস্ত সম্পদ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। যাহাদের শ্রমের বিনিময়ে এই সম্পদ উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে সেই শ্রমিক শ্রেণীকে ইহারা অল্প বেতনে খাটাইয়া লইতেছে; শ্রমের উপযুক্ত মূল্য তাহারা পাইতেছে না। ইহার ফলে দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোক বিরাট শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করিয়া দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে আর শ্রমিকরা দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। সমাজের এই অসাম্য দূর করিবার জন্য সাম্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। সাম্যবাদের লক্ষ্য হইল প্রতিদেশে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া জাতীয় সম্পদ এমনভাবে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দূর হইয়া যায় এবং সকলেই সুখেস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে।

মার্ক্স বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটি অনিবার্য সংগ্রাম হইবে এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিক শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব আসিবে। তখন সাম্যবাদের আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

**জারের কঠোর শাসন—বিদ্রোহের পথে রাশিয়া।** বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত রাশিয়ায় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাশিয়ার সম্রাটদের উপাধি ছিল 'জার'। রাষ্ট্রশাসনের চরম অধিকার জারদের হাতে ছিল। প্রগতি বিরোধী অভিজাত শ্রেণীর সহায়তায় তাঁহারা শাসন পরিচালনা করিতেন। অভিজাত শাসকশ্রেণী জনমত উপেক্ষা করিয়া অতি কঠোর পীড়ন নীতির সাহায্যে শাসন করিত। প্রজারা কোন অধিকার দাবি করিলে, অথবা শাসকবর্গের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে, চরম নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাদের দমন করা হইত। সামান্য সন্দেহ হইলেই নাগরিকদের নির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। সমাজে অভিজাত-ভূস্বামী শ্রেণী সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করিত। অধিকাংশ ভূ-সম্পত্তি ইহাদের হাতে ছিল। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনসম্পদের মালিক ছিল অভিজাত শ্রেণী ও বিদেশী মালিকরা। সমাজের নীচে ছিল অগণিত চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়। ইহারা উদয়াস্ত কাজ করিত অথচ তুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না। ইহাতে দুর্দশা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। রাশিয়ার সামান্য সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই দুঃসহ অবস্থার অবসান করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিয়াছিল। জাররাও সৈন্য-বাহিনী ও পুলিশের সাহায্যে এই আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন। কিন্তু জার ও অভিজাত শ্রেণী চেষ্টা করিলেও সাম্যবাদ জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইহারা রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া জারদের স্বৈরশাসন অবসান করিয়া সাম্যবাদের

আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। লেনিন, ট্রট্স্কি, স্টালিন প্রভৃতি নেতারা সমাজবাদীদল ( সোশ্যাল ডেমোক্রটিক পার্টি ) গঠন করিয়া এই কাজে অগ্রণী হইলেন। জার দমননীতি চালাইলেন। নেতাদের অনেকেই কারাবরণ করিলেন। কেহ কেহ পলাইয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়া আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সাম্যবাদী আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিল, মাঝে মাঝে ধর্মঘট ও ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটিতে লাগিল। জার চাপে পড়িয়া প্রজাদের রাজনৈতিক অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত করিতে পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন। জনসাধারণের অসন্তোষ তীব্র হইয়া উঠিল। ইহার ফলে জারতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী হইল।

**বিপ্লবের আরম্ভ—জারতন্ত্রের পতন।** দেশের অভ্যন্তরে যখন জার-বিরোধী মনোভাব ও অসন্তোষের মাত্রা দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছিল তখন আসিল প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ ( ১৯১৪ )। এই যুদ্ধে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসীদের পক্ষে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু জার ও সেনাপতিদের অযোগ্যতার জন্য জার্মানীর হাতে রাশিয়ার সেনাবাহিনী বার বার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইতে লাগিল, হাজার হাজার সৈন্য হতাহত হইল। সরকারী অযোগ্যতার ফলে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর এই পরাজয়ে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইল; সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জার ও তাঁহার মন্ত্রীরা ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। ইতিমধ্যে খাদ্যের অভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যপ্রার্থী জনতা রাজধানী পেট্রোগ্রাডে এক বিরাট ধর্মঘট আরম্ভ করিল। লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটী শ্রমিক শহরের রাস্তায় রাস্তায়

লেনিন

ট্রটস্কি

স্টালিন

শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সরকার ইহাদের দমন করিতে সৈন্যবাহিনী পাঠাইল; সৈন্যেরা দলে দলে ধর্মঘটীদের সাহত যোগ দিল। ক্রমে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। তখন শাসনব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জার ২য় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। জারের সিংহাসন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনশত বৎসরের স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল; বিপ্লব জয়যুক্ত হইল।

জারের পতনের পরে জাতীয় মহাসভা ডুমার নেতৃবৃন্দ একটি অস্থায়ী গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন। বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকরা এই সময় যুদ্ধ অবসান করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা, খাদ্যের অভাব পূরণ এবং কৃষকদের মধ্যে নূতন করিয়া ভূমি বণ্টনের দাবি তুলিয়াছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট এই সকল সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিল না। উহা জনসাধারণকে উদ্যমের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে বলিল।

প্রথমে পেট্রোগ্রাডে ধর্মঘট ও বিপ্লব যখন সুরু হয় তখন শহরের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা একটি কমিটি গঠন করিয়া বিপ্লব পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। এই কমিটির নাম হয় সোভিয়েট। পরে সোভিয়েট সৈনিকদের প্রতিনিধিরাও যোগ দেয়। পেট্রোগ্রাডের দেখাদেখি অন্যান্য শহরেও সোভিয়েট গড়িয়া উঠে। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট বলশেভিক দল ছিল প্রবল। সাম্যবাদী বলশেভিক দলই পরে কমিউনিস্ট নামে পরিচিত হয়। বলশেভিক কথাটির মানে সংখ্যাগুরু। পেট্রোগ্রাডের সোভিয়েট অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধনীতি সমর্থন করিল না; ইহার সহিত গভর্ণমেণ্টের বিরোধ দেখা দিল।

**লেনিনের নেতৃত্ব গ্রহণ—কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা।** ঠিক এই সময়ে বলশেভিক দলের নেতা লেনিন রাশিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তরুণ বয়সে লেনিন বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বড় হইয়া তিনি দলের একজন নেতা হইলেন। বিপ্লবী দলের সহিত সংযুক্ত এই অপরাধে তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আশ্রয় লইলেন এবং সেখান হইতে রাশিয়ার বিপ্লবী দলকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহকর্মী ট্রট্‌স্কি ও স্টালিনও বহুকাল জেল ও নির্বাসনে কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারাও এই সময় রাশিয়ায় আসিয়া লেনিনের সহিত যোগ দিলেন। লেনিন আসিয়াই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লব আরম্ভ হইল। সোভিয়েট সৈন্যরা একে একে সরকারী দপ্তরগুলি দখল করিয়া লইল। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট শূন্যে মিলাইয়া গেল। লেনিন নূতন গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট হইলেন। তখন হইতে সোভিয়েট রাশিয়ায় ৭ই নভেম্বর তারিখটি জাতীয় বিপ্লব দিবসরূপে পালিত হইয়া আসিতেছে।

লেনিন যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন রাশিযার দুর্দশা চরমে আসিয়াছে। জার্মানীর সহিত যুদ্ধে সেনাবাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। দেশের মধ্যে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং খাদ্যাভাবে জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। ইহার উপর দেশের ধনিক শ্রেণী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিদেশীদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। এত বিপদেও লেনিন ভীত হইলেন না। তিনি প্রথমেই জার্মানীর সহিত সন্ধি করিয়া যুদ্ধের অবসান করিলেন। তারপর তিনি একটি শক্তি-শালী সমাজতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ

পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এ পথে দুরূহ বাধা আসিল।

রাশিয়ায় কমিউনিস্ট গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হওয়ায় এবং ইহার উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ভীত হইল। ইহারা একযোগে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিল। ইহাদের সহিত হাত মিলাইল রাশিয়ার বিপ্লব-বিরোধী ধনিকশ্রেণী। এতবড় বিপদের সম্মুখীন হইয়াও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ বিচলিত হইলেন না। লেনিন ও ট্রটস্কি শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমগ্র দেশকে একটি বিরাট সেনাশিবিরে পরিণত করিলেন এবং রাশিয়ার প্রসিদ্ধ 'লালফৌজ' গড়িয়া তুলিলেন। দুই বৎসর বহু দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে অটল সংকল্পের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া রাশিয়া শত্রুদের পরাজিত করিল। সোভিয়েট গভর্ণমে রক্ষা পাইল। যুদ্ধান্তে লেনিন ও কমিউনিস্ট দল অতি দৃঢ়তার সহিত রাশিয়ার পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

**সোভিয়েট রাশিয়া ও দেশের পুনর্গঠন।** লেনিন প্রথমেই রাশিয়ায় এক শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ধনিক ও ভূস্বামী শ্রেণীর হাত হইতে শিল্পব্যবসায় ও জমির মালিকানা কাড়িয়া লইলেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হইল। রাষ্ট্র সমস্ত জাতির প্রতিনিধি হিসাবে ইহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। কৃষকদের বুঝাইয়া অথবা জোর করিয়া ছোট ছোট খণ্ড জমি চাষ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার বদলে সমস্ত খণ্ড জমিগুলি একত্র করিয়া বড় বড় যৌথ-কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত করা হইল। গ্রামের সমস্ত চাষীরা একত্র হইয়া সমবায় প্রথায়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল যৌথ কৃষিক্ষেত্র চাষ করিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি

লোপ করা হইল। নূতন সমাজে ছোট বড়, অভিজাত অনভিজাত কেহ রহিল না, সকলেই হইল সমান নাগরিক। এই উপায়ে রাশিয়ায় ধন বণ্টনের সমতা আসিল।

**পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।** জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বহু জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইল। বিনাব্যয়ে প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। বহু হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যাগার দেশের নানাস্থানে স্থাপিত করা হইল। শহর ও গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা হইল। দেশের সর্বত্র বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, খাল ও পোল তৈয়ার করা হইল। পর পর কতকগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া দেশের এই সব বহুমুখী উন্নতি সাধন করা হইল। এই সকল পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ স্টালিনের শাসনকালে আরম্ভ হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশে অনেক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহু গুণে বাড়িয়া গেল এবং দেশের সম্পদ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষি ও শ্রমশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল তাহাতে দেশের অধিবাসীদের কর্মের সংস্থান হইল। রাশিয়ায় কোন বেকার নাই, সেখানে প্রত্যেক মানুষ খাইতে পায়, কাজ পায় এবং লেখাপড়ার সুযোগ পায়।

**সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা।** বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় যে নূতন রাষ্ট্র স্থাপিত হইল তাহার নাম সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ষোলটি রাষ্ট্রের সমষ্টি লইয়া গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্র এক-একটি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র। সমস্ত দেশে গ্রাম অঞ্চলে শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েট আছে। ইহারা শহর ও জেলার সোভিয়েট নির্বাচিত
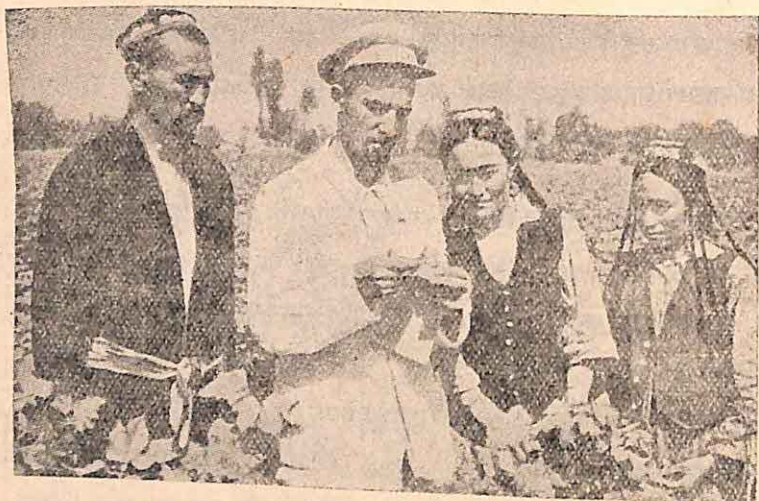
সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত উজ্‌বেকিস্তানের অধিবাসী

পামীর অঞ্চলের অধিবাসী

করে। আবার জেলা ও শহর সোভিয়েট দ্বারা প্রাদেশিক সোভিয়েট নির্বাচিত হয়। প্রাদেশিক সোভিয়েটগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সোভিয়েট নির্বাচিত করে। বিভিন্ন
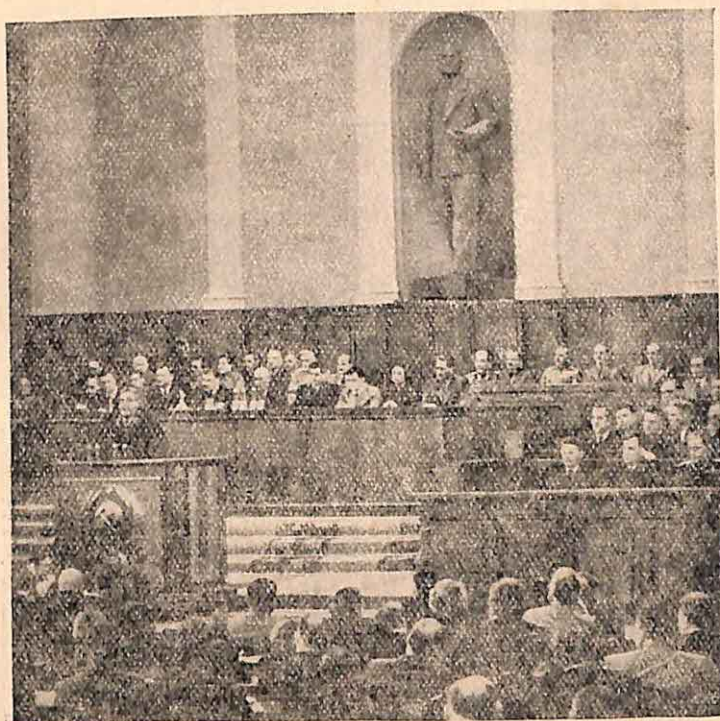
সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন

রাষ্ট্র সোভিয়েটের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া সর্বোচ্চ সোভিয়েট বা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়। বর্তমানে শাসনতান্ত্রিক সমস্ত ক্ষমতা কমিউনিস্ট পার্টির হাতে আছে।

## কালপঞ্জী

কার্ল মার্ক্স্—১৮১৮—১৮৮৩

লেনিন—১৮৭০—১৯২৪

স্টালিন—১৮৭৯—১৯৫৩

রুশ বিপ্লব ও জারের সিংহাসন ত্যাগ—১৯১৭ ( মার্চ

বলশেভিক বিপ্লব—১৯১৭ ( ৭ই নবেম্বর )

---

## বিশ্ব মহাযুদ্ধ—বিশ্বজাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিসংঘ

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধ কেবলমাত্র শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে দু'টি বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছে। লোকক্ষয় ও সম্পদহানির দিক হইতে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বিগত কয়েক শতাব্দীর বড় বড় যুদ্ধগুলি একত্র করিলেও ইহার সমান হইবে না। এই দু'টি যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসের গতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। উভয় যুদ্ধেরই সূচনা করিয়াছে জার্মানী। কিন্তু যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একা জার্মানীর উপর চাপাইলে ভুল হইবে। উভয় যুদ্ধের মূলে রহিয়াছে দু'টি বড় কারণ—উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

**মহাযুদ্ধের কারণ।** ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একে একে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া জার্মানী ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সামরিক বলে বলীয়ান ঐক্য-বদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পর দেখিতে দেখিতে নবীন জার্মানী শিল্প, বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যাশ্চর্য উন্নতি সাধন করিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলির সমকক্ষ হইয়া উঠিল। শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ বিস্তার ও নৌবল বৃদ্ধির প্রয়োজনও দেখা দিল। জার্মান শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য জার্মানী বিশ্বের বাজারে অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। আবার দেশের কলকারখানা চালু

রাখিবার জন্য সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে উপনিবেশ বিস্তারে অগ্রসর হইল। বিসমার্ক যতদিন শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন ততদিন তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত কোনরূপ গোলযোগ ঘটিতে দেন নাই। ১৮৯০ সালে জার্মান সম্রাট বা কাইজার ২য় উইলিয়ম তাঁহাকে বিদায় দিয়া নিজেরহাতে রাষ্ট্র শাসনের ভার নিলেন। তিনি ছিলেন অতি দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী। এই সময় জার্মান জাতির মনে একটি ধারণা জন্মিল যে, তাহারা পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সমূহকে শিক্ষায় ও সভ্যতায় উন্নত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব বিধাতা তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। কাইজারের নেতৃত্বে শক্তিশালী জার্মানী তখন সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য স্থাপনের কল্পনায় মাতিয়া উঠিল।

কাইজার ২য় উইলিয়াম

কাইজার ২য় উইলিয়ম শাসনভার গ্রহণ করিয়া উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই কার্যে অগ্রসর হইতেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার নিকট হইতে বাধা আসিল। তখন জোর করিয়া নিজের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানী অস্ত্রসজ্জা ও নৌবল বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল। জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদ অন্যান্য জাতির পক্ষে ঘোরতর বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল; ইউরোপে 'জার্মান আতঙ্ক' দেখা দিল।

১৮৭১ সালে জার্মানীর নিকট পরাজিত হইয়া ফ্রান্স পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হইল এবং সমস্ত জাতিকে সমর শিক্ষা দিয়া সৈন্যবল বৃদ্ধির আয়োজন করিল। ফ্রান্সের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তারপর ১৮৮২ সালে ইটালী জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার সহিত যোগ দিল। ইহার ফলে ইউরোপে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালী লইয়া ত্রিশক্তি চক্র স্থাপিত হইল। ফ্রান্স একেবারে কোনঠাসা হইয়া রহিল। বিসমার্ক যতদিন রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন ততদিন তিনি রাশিয়ার সহিত সখ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পতনের পরে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিল। কাইজার ২য় উইলিয়ম এই সময় তুরস্কের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া বলকান ও পশ্চিম এশিয়ায় ধীরে ধীরে জার্মান প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। বহুকাল হইতেই রাশিয়া তুরস্ক অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তুরস্কে জার্মান প্রভাব বিস্তৃত হইবার ফলে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। এই বিরোধের সুযোগ লইয়া ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল।

এতদিন ইংলণ্ড ইউরোপের রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া ছিল। কিন্তু জার্মানী যখন ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদ্যত হইল এবং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করিল তখন ইংলণ্ড স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত যোগ দিল। ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি দু'টি বিবাদমান শক্তিচক্রে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং উভয় দলই দ্রুত নিজ নিজ সামরিক বল বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে বলকানেও অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এখানে অস্ট্রিয়া ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। বলকানে প্রধানতঃ

ছিল স্লাভ জাতির বাস। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যেও স্লাভজাতি ছিল সংখ্যায় খুব বেশি। ইহাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন চলিতেছিল এবং এই উদ্দেশ্যে অনেক গুপ্ত সমিতিও স্থাপিত হইয়াছিল। রাশিয়া ও সার্বিয়া এই স্লাভ রাজ্য দু'টি ছিল ইহাদের পৃষ্ঠপোষক। আবার স্বাধীনতাকামী স্লাভদের গুপ্ত সমিতি-গুলির বড় ঘাঁটি ছিল সার্বিয়া। বলকান অঞ্চলের আধিপত্য লইয়া রাশিয়া ও সার্বিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার বিরোধ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপ প্রকাণ্ড একটি বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। এই বারুদের স্তূপকে প্রজ্বলিত করিবার স্ফুলিঙ্গ আসিতেও দেরী হইল না।

১৯১৪ সালের জুন মাসে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ সফরে বাহির হইয়া বসনিয়া প্রদেশের সেরাজেভো শহরে একজন বিপ্লবীর গুলিতে সস্ত্রীক নিহত হইলেন। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করিল এবং উহাকে একটি চরমপত্র দিয়া কতগুলি সর্ত গ্রহণ করিতে বলিল। সার্বিয়া কয়েকটি সর্ত গ্রহণ করিল; কয়েকটি সর্ত স্বাধীন জাতির পক্ষে গ্রহণ করা অসম্মানজনক মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়া সার্বিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করিল। ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিল। জার্মানী তখন ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংলণ্ডও পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিল। দেখিতে দেখিতে ইউরোপে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল এবং সমস্ত বিশ্বে তাহা ছড়াইয়া পড়িল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে একে একে ইটালী, জাপান, আমেরিকা এবং চীন ইংরাজ ও ফরাসীদের পক্ষে যোগ দিল। তুরস্ক এবং বলকানের কয়েকটি রাজ্য জার্মানীর সহিত যোগ দিল।

ভারতবর্ষ তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সুতরাং ইহাও যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িল। এ যুদ্ধ জলে, স্থলে এবং আকাশে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

**জার্মানীর পরাজয়।** চারি বৎসর এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। কয়েক বৎসর অতি সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করা সত্ত্বেও জার্মানীর ক্ষয়ক্ষতি এত বেশি হইয়াছিল যে, তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। এদিকে জার্মানীর মিত্র রাজ্যগুলিও পরাজিত হইয়া ইঙ্গ-ফরাসী বা মিত্রপক্ষের হাতে আত্মসমর্পণ করিল। আবার জার্মানীর অভ্যন্তরেও এই সময় রাষ্ট্র-বিপ্লব দেখা দিল। কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হইল। ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর জার্মানী মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধ-বিরতি-চুক্তি করিল। পর বৎসর যুদ্ধে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা প্যারিসে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া সন্ধির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনার পর সন্ধির সর্তসমূহ স্থির হইল। ভার্সাই রাজপ্রাসাদে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহা ভার্সাই সন্ধি নামে খ্যাত।

**ক্ষয়-ক্ষতি ও যুদ্ধের ভয়াবহতা।** এই যুদ্ধে যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টগুলি যুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বেই নূতন নূতন শক্তিশালী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের কার্যে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করিয়াছিল এবং ইহার জন্য অজস্র অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে প্রতি দেশেই উন্নত ধরণের বিমান, সাবমেরিণ, কামান-বন্দুক, ট্যাঙ্ক ও শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য নানাবিধ বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তুত হইল এবং যুদ্ধকালে এই সব ভয়াবহ অস্ত্র ও গ্যাস
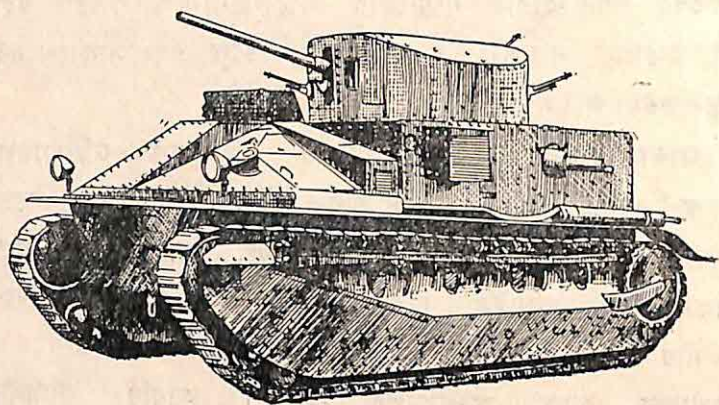
ট্যাঙ্ক
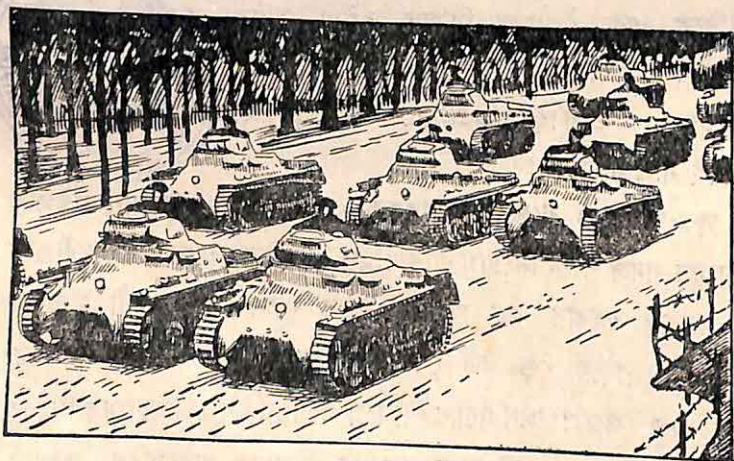
জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী
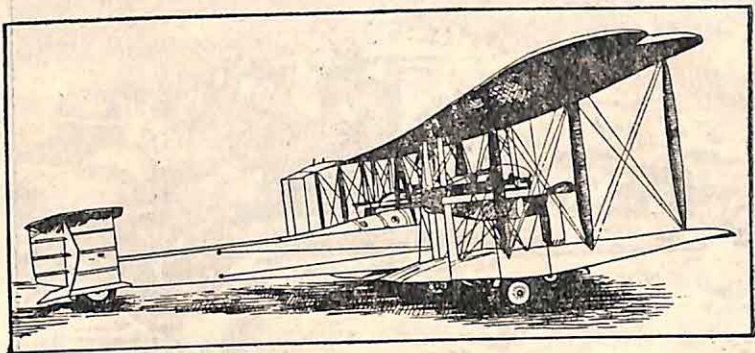
প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমারু বিমান
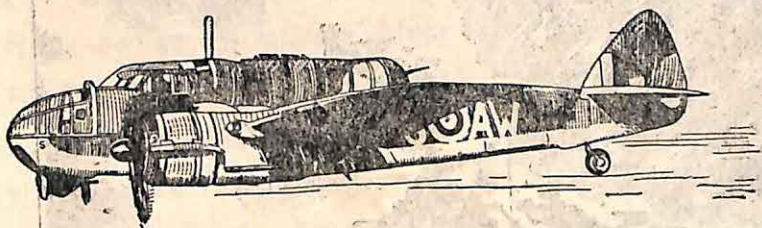
দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমারু বিমান
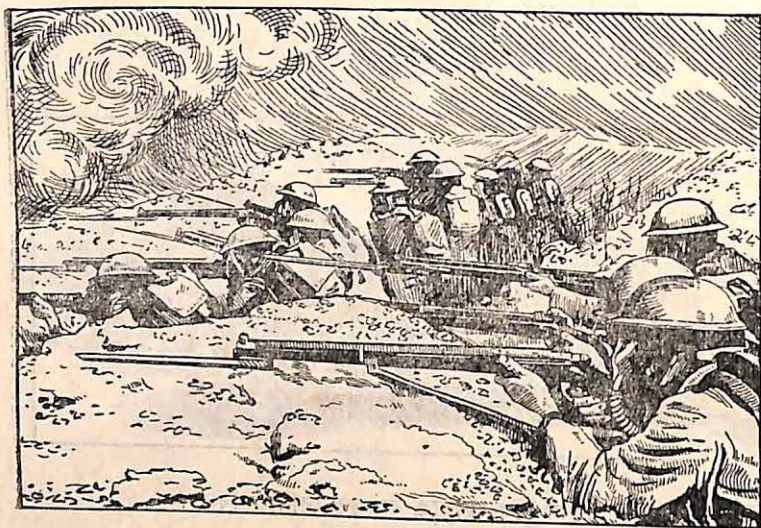
গ্যাস-মুখোস পরিহিত পরিখার মধ্যে যুদ্ধরত সৈনিকগণ
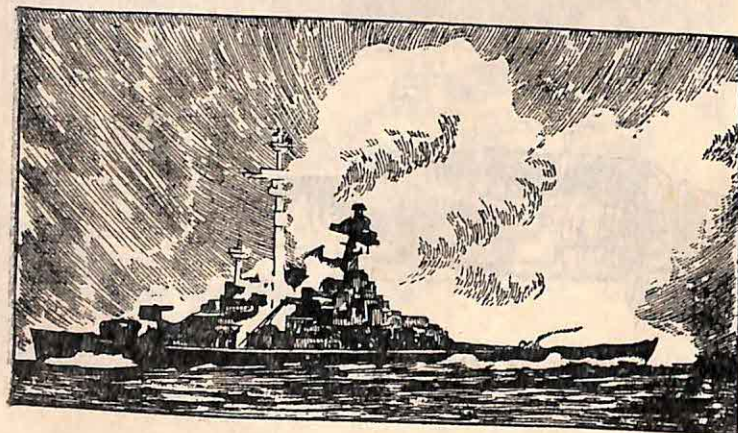
জার্মান 'ইউ-বোট' বা ডুবো জাহাজ ( সাবমেরিন )

ব্যবহার করা হইল। বোমারু বিমান শত্রুর দেশে যাইয়া শহর, কলকারখানা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আকাশ হইতে বোমা ফেলিতে লাগিল। ইহাতে অসংখ্য নিরীহ লোকের প্রাণ গেল। বড় বড় কলকারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। জার্মানীর শক্তিশালী সাবমেরিণ বা ডুবো জাহাজগুলি বড় বড় যুদ্ধের জাহাজ ও বাণিজ্য-পোত ও যাত্রীবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিতে লাগিল। ইহার ফলেও হাজার লোক অকালে মারা গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্য-বাহিনী পরিখা খুঁড়িয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস জল, কাদা, বরফ ও অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া, দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। কামান-বন্দুকের গোলার আঘাতে, বিমান হইতে বিস্ফোরক বোমা পতনের ফলে উভয় পক্ষের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগের ফলে কয়েক লক্ষ সুস্থ ও সবল মানুষ চির-জীবনের জন্য পঙ্গু ও অকর্মণ্য হইয়া গেল। যুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানী দূর পাল্লার-এক ধরণের অতিকায় কামান আবিষ্কার করিয়াছিল। ইহার গোলা ৭৫ মাইল দূরে যাইয়া লক্ষ্য বস্তুর উপর পড়িত। এইরূপ একটি গোলা একবার প্যারিসের একটি চার্চের উপর পড়িয়া-ছিল। চার্চে তখন প্রার্থনা চলিতেছিল। একটি গোলার আঘাতে ৭৫ জন লোক মারা গিয়াছিল এবং ৯০ জন আহত হইয়াছিল।

গ্যাস মুখোস পরিহিত সৈন্য

এই যুদ্ধে হতাহতের একটি হিসাব পাওয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের মোট ৬½ কোটি সৈন্য যুদ্ধে নামিয়াছিল। তাহার মধ্যে নিহতের

সংখ্যা হইল এক কোটি তিরিশ লক্ষ, আহত হইয়াছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ। ইহার মধ্যে ৭০ লক্ষ চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হইয়াছিল। বন্দীর সংখ্যা হইল ৩০ লক্ষ। বিমান হইতে বোমা বর্ষণের ফলে এবং অন্যান্য কারণে ১ কোটি ৩০ লক্ষ অসমারিক লোক নিহত হইয়াছিল। যুদ্ধে কোন্ পক্ষের কত ব্যয় হইয়াছে তাহার একটা হিসাব করা হইয়াছে। মিত্রপক্ষের মোট ব্যয় হইয়াছিল প্রায় ৫৫ হাজার কোটি টাকা এবং জার্মান পক্ষে ব্যয় হইয়াছে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা। যুদ্ধের শেষ দিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের ব্যয় প্রতি ঘণ্টায় পড়িয়াছে প্রায় চার কোটি টাকা। এই যুদ্ধে বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়াছিল বহু শত এবং ইহাদের মোট মাল বহনের ক্ষমতা ছিল প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন। এই সকল হিসাব হইতে ধারণা করা যায় যে একটি বড় যুদ্ধে কি বিরাট পরিমাণ ক্ষয় ক্ষতি হয়। এই অর্থ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করিলে কোটি কোটি মানুষের কত দুঃখ, কত অভাব দূর হইতে পারিত।

**শান্তি স্থাপন**। যুদ্ধের সময়ে বার বার ঘোষণা করা হয় যে, যুদ্ধ শেষ হইলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে কোন ভেদাভেদ না করিয়া ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করা হইবে এবং প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু সন্ধির সর্ত রচনা কালে নীতি মাত্র আংশিক ভাবে গ্রহণ করা হইল। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়া এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করা হইল। ইহার বাকি অংশ ইটালী, সার্বিয়া ও রোমানিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত করা হইল। তুরস্ক সাম্রাজ্যকেও বিভক্ত করিয়া কয়েকটি আরব রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল এবং পোল্যাণ্ডকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করা হইল।

পরাজিত জার্মানী সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইল তাহাতে ন্যায় ও নীতির মর্যাদা রক্ষা করা হইল না। মিত্র শক্তিবর্গ একটি প্রতিশোধের মনোভাব লইয়া জার্মানীর উপর অতি নিষ্ঠুর কতকগুলি সর্ত চাপাইয়া দিল। জার্মান রাষ্ট্রের কয়েকটি অংশ কাড়িয়া লইয়া তাহা ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। জার্মানীর উপনিবেশগুলি বিজয়ী রাষ্ট্র সমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইল। ইহা ছাড়া যুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার জন্য পণ্যে ও অর্থে বিপুল ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে জার্মানীকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। ভবিষ্যতে জার্মানী যাহাতে আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে এজন্য তাহার সামরিক শক্তি একেবারে পঙ্গু করিয়া দেওয়া হইল। জার্মানীর পক্ষে এই সকল সর্ত পালন করা একেবারেই সাধ্যাতীত ছিল। প্রথম দুই বৎসরে অর্থ ও সম্পদে জার্মানীর নিকট হইতে যে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইল তাহার ফলে জার্মানী একেবারে নিঃস্ব হইয়া গেল। উহার শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ক্ষয়ক্ষতি সামলাইয়া দেশের সম্পদ পুনরায় গড়িয়া তুলিবার কোন আশাই রহিল না। খাদ্যের অভাবে, অর্থের অভাবে, কর্মের অভাবে, রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। জার্মানীতে মানুষের জীবনে দেখা দিল অভাবনীয়, অপরিসীম দুর্গতি। কোন শক্তিশালী আত্ম-সম্মান সম্পন্ন জাতি এ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল মানিয়া লইতে পারে না। জার্মানীও পারিল না। সমগ্র দেশে ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করিবার মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিল। জার্মানীতে হিটলারের উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের বীজ ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। জার্মানী ছাড়া তুরস্কেও ভার্সাই সন্ধির অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা দিল।

**বিশ্বজাতি সংঘ।** ভার্সাই সন্ধির সর্ত রচনাকালে শান্তি সম্মেলন একটি বড় কাজ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত না হয় এবং স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যাহাতে আপোষ-আলোচনার দ্বারা নিজেদের বিবাদবিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া লইতে পারে এজন্য একটি 'বিশ্বজাতি সংঘ' স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। একাজে অগ্রণী ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন।

বিশ্ব জাতিসংঘের অধিবেশন

এই পরিকল্পনা অনুসারে, ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারী 'বিশ্বজাতি সংঘ' বা 'লীগ অব নেসন্‌স' স্থাপন করা হইল। জেনেভা শহরে ইহার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হইল। লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকেই প্রতিশ্রুতি দিল, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা একেবারে শেষ না হইলে তাহারা কেহ অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না। কেহ ইহা লঙ্ঘন করিয়া অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলে সংঘ তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া তাহাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের সমাধান করিতে বাধ্য করিবে। সংঘের কাজ চালাইবার জন্য একটি পরিষদ ও সমিতি গঠন করা হইল। আন্তর্জাতিক কলহের বিচারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠন করা হইল। ইহা হল্যাণ্ডের হেগ শহরে স্থাপিত হইল। ইহা ছাড়া একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিস খোলা হইল। শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত সমস্যা মীমাংসার ভার ইহার উপর ন্যস্ত হইল।

সংঘ গঠিত হইবার পর আমেরিকা ইহাতে যোগদান করিল না। এবং জার্মানী, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুরস্ককে ইহার সভ্য করা হইল না। জাপান, জার্মানী ও ইটালী পরে জাতিসংঘে যোগ দিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই ইহারা সংঘ ত্যাগ করিয়া গেল।

***বিশ্বজাতি সংঘের ব্যর্থতা।*** বিশ্বজাতি সংঘ স্থাপিত হইবার পর ইহা কয়েকটি ছোটখাট রাজনৈতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করিয়া দিল। কিন্তু প্রধান প্রধান শক্তিগুলির স্বার্থ যে সকল বিষয়ের সহিত জড়িত থাকিত সেই সকল বিষয়ের কোন সুমীমাংসা করিতে পারিল না। ইহার প্রধান কারণ, বড় বড় শক্তিগুলি নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া সংঘের আদর্শকে মানিয়া লইবার কোন চেষ্টা করে নাই। তাহা ছাড়া বড় বড় জাতিগুলিকে সংঘের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার কোন উপায়ও উহার হাতে ছিলনা। ফলে কিছুকালের মধ্যে সংঘ বড় বড় শক্তিগুলির স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত হইয়া গেল। ১৯৩৫ সালে ইটালী অন্যায়ভাবে আবিসিনিয়া রাজ্য আক্রমণ করিল। আবিসিনিয়া সংঘের নিকট আপীল করিল। সংঘ ইটালীকে দোষী সাব্যস্ত করিল। কিন্তু প্রধান প্রধান শক্তিগুলি ইটালীর বিরুদ্ধে

কোন ব্যবস্থা গ্রহণে রাজী হইল না। ইটালী আবিসিনিয়া দখল করিয়া লইল। ইহার পর জাপান চীন আক্রমণ করিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে উদ্যত হইল (১৯৩১)। সংঘ জাপানের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিল না। এই সকল কারণে সংঘ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহার অল্পকাল পরেই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিশ্বজাতিসংঘ মাত্র ২০ বৎসর টিঁকিয়াছিল।

**দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সূচনা।** ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলির মধ্যে অনেক গুরুতর ত্রুটি ছিল; এজন্য ইহা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। অল্পকালের মধ্যেই ইউরোপের কয়েকটি দেশে নানা সমস্যা দেখা দিল। প্রথমেই গোলযোগ দেখা দিল ইটালীতে। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই ইটালীতে নিদারুণ আর্থিক দুর্গতি দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধের শেষে তাহার আর্থিক সংকট চরমে উঠিল। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া পড়িল, দেশে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিদারুণ অভাব দেখা দিল। ইহার ফলে জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের উপরে ভীষণ অসন্তুষ্ট হইল। এই সময় সমাজতন্ত্রীদল প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা কলকারখানার শ্রমিকদের হাত করিয়া রাশিয়ার আদর্শে ইটালীতে একটি কমিউনিস্ট সরকার স্থাপিত করিতে সচেষ্ট হইল। শ্রমিকরা বিদ্রোহী হইয়া অনেক স্থানে কলকারখানা দখল করিয়া লইল, দেশে অরাজক অবস্থা দেখা দিল।

**মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট দল।** ঠিক এই সময় ইটালীতে মুসোলিনি নামে একজন খ্যাতনামা নেতার আবির্ভাব হইল। তিনি সমাজতন্ত্রী দলকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের লইয়া একটি দল গড়িলেন। ইহারই নাম ফ্যাসিস্ট দল। দেশের শিল্পপতিরা এবং সম্পন্ন লোকেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। ১৯২২ সালে

মুসোলিনি গভর্ণমেণ্ট দখল করিয়া লইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিলেন। দেখিতে দেখিতে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট দলের সাহায্যে দেশের সর্বময় প্রভু হইয়া বসিলেন। তিনি ইটালীতে শাসন শৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়া কিছু পরিমাণে দেশের বৈষয়িক উন্নতি আনিলেন। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য-বিস্তার করিয়া ইটালীর পূর্বগৌরব ফিরাইয়া আনিবেন। এজন্য তিনি বিরাট সৈন্য ও নৌবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। ইহাতে এত অর্থ ও সম্পদ নিয়োগ করা হইল যে, দেশের বৈষয়িক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। ইউরোপে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘনাইয়া আসিল। ইটালীর জনসাধারণ কতকটা স্বেচ্ছায়, কতকটা ভয়ে তাহার সব ব্যবস্থা মানিয়া লইল। ইটালীতে গণতন্ত্রের সমাধি হইল।

মুসোলিনি

**হিট্‌লার—নাৎসীদলের অভ্যুত্থান।** মুসোলিনি যখন ইটালিতে একনায়ক শাসন প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় জার্মানীতেও খুব গোলযোগ চলিতেছিল। যুদ্ধের শেষে জার্মানীতেও অপরিসীম দুর্গতি দেখা দিয়াছিল। বিজয়ী পক্ষের ক্ষতিপূরণ দাবি মিটাইতে যাইয়া জার্মান জাতি একেবারে নিঃস্ব ও পঙ্গু হইয়া পড়িল। দেশে মারাত্মক ভাবে খাদ্যাভাব ও বেকার সমস্যা আসিল। জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিল। এই সময় জার্মানীতে হিট্‌লারের নেতৃত্বে এক নূতন রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিল। ইহা ন্যাশনাল

সোশ্যালিস্ট বা নাৎসী দল নামে পরিচিত। ভার্সাই সন্ধি বাতিল করিয়া, একটি শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই হইল এই দলের লক্ষ্য।

হিটলার ১৯৩৩ সালে জার্মানীর প্রধান মন্ত্রীপদ লাভ করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে নিলেন। মুসোলিনির ন্যায় তিনিও নির্বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করিয়া দেশের সর্বেসর্বা হইয়া বসিলেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি করিলেন এবং ভার্সাই সন্ধি সোজাসুজি অগ্রাহ্য করিয়া দেশের সামরিক বল বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে জার্মানীর বিমানবহর ও নৌবহর সংখ্যায় ও শক্তিতে অন্য অনেক দেশের তুলনায় বড় হইয়া উঠিল। জার্মানীতেও গণতন্ত্রের সমাধি হইল। জার্মানীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আতঙ্ক আরও বাড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে হিট্‌লার ও মুসোলিনির মধ্যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইল।

হিট্‌লার

এই সময় সুদূর প্রাচ্যে জাপান শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। জাপানের লক্ষ্য ছিল পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে তাহার নেতৃত্বাধীনে একত্র করিয়া সমগ্র পূর্ব এশিয়ার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা। এজন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তিগুলির সহিত বিবাদ অনিবার্য বুঝিয়া জাপান জার্মানী ও ইটালীর সহিত হাত মিলাইল। এইরূপে বিশ্বের তিনটি শক্তিশালী জাতি একত্র হইয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে উদ্যত হইল।

যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া হিটলার ইউরোপের জার্মান প্রধান অঞ্চলগুলি জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রথমেই অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইলেন, কারণ অস্ট্রিয়ার অধিবাসীরা ছিল পুরাপুরি জার্মান। ইহার পর তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্যের সুদেতান প্রদেশ দাবি করিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইলেও তখন যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং হিটলারের দাবি তাহারা স্বীকার করিয়া লইল। হিটলার সৈন্য পাঠাইয়া সুদেতান ও তাহার সঙ্গে সমস্ত চেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্যটিই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। রাশিয়া হিটলারের এই অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধে ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। ইউরোপ নিঃশব্দে হিটলারের দস্যুতা মানিয়া লইল। ইহার পর হিটলার পোল্যাণ্ড জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাশিয়ার নিকট হইতে বাধা আসিতে পারে মনে করিয়া তিনি উহার সহিত একটি চুক্তি করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল, রাশিয়া ও জার্মানী পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে না, আপোষে বিবাদ মিটাইয়া লইবে। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ সুরু হইয়া গেল এবং ইহা সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল।

**যান্ত্রিক যুদ্ধ—যুদ্ধের নৃশংসতা।** ব্যাপকতা, ভয়াবহতা এবং লোকক্ষয় ও ধ্বংসের দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে, এ যুদ্ধ প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধকে অনেক গুণে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই ভয়াবহ এবং নৃশংস সংগ্রাম একাদিক্রমে ছয় বৎসর চলিয়াছিল। যুদ্ধ যখন সুরু হইল তখন একদিকে ছিল জার্মানী ও ইটালী এবং অপরদিকে ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং উহাদের সাম্রাজ্যের

অন্তর্গত বিভিন্ন দেশগুলি। যুদ্ধ চলিবার কিছুকাল পরে আমেরিকা ও রাশিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যোগদান করে। জাপান দুই বৎসর পরে জার্মানীর সহিত যোগ দিয়া মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করে। ফলে প্রায় সমস্ত পৃথিবীটাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়া গেল। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল সর্বত্রই যুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। উভয় পক্ষই বিজ্ঞানের সাহায্যে অতি আধুনিক ও ব্যাপক ধ্বংসকারী যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এ যুদ্ধকে এজন্য যান্ত্রিক যুদ্ধ বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষই বিমান বলের উপর নির্ভর করিয়াছে বেশি। যে অঞ্চল দিয়া সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হইয়াছে তাহার আগে আগে গিয়াছে বিমান বাহিনী। আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া, মেশিন গান চালাইয়া শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করিয়া সৈন্যবাহিনীর অগ্রসর হইবার পথ করিয়া দিয়াছে। অতিকায় বোমারু বিমান হইতে বড় বড় বোমা ফেলিয়া শত্রুদেশের কলকারখানা, গ্রাম ও নগর ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক যুধ্যমান জাতি তাহার সমস্ত সম্পদ, লোকবল এবং শেষ রক্ত বিন্দু যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছে। এই যুদ্ধকালে বন্দীদের প্রতি এবং অসামরিক জনসাধারণের প্রতি যে নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাহা চিরকাল কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। কাঁটাতারে ঘেরা লোহার খাঁচার মত বন্দীশালায় হাজার হাজার শত্রুসৈন্য রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের উপর চলিয়াছে হিংস্র অত্যাচার। বন্দীদের উপর যখন তখন চলিয়াছে গুলীবর্ষণ ; আবার মাঝে মাঝে বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ বিরাট ঘরে হাজার হাজার বন্দীকে একত্র ঢুকাইয়া দিয়া নিমেষে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। অসামরিক জনসাধারণের উপরেও অত্যাচার কম করা হয় নাই। বিজিত দেশের জনসাধারণের উপর স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু

নির্বিশেষে সৈন্যবাহিনী যে অত্যাচার করিয়াছে সেই সব কাহিনী শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মানুষ তখন হিংস্রতায় পশুরও অধম হইয়াছিল।

**যুদ্ধের গতি।** যুদ্ধ সুরু হইবার পর জার্মানীর যান্ত্রিক ও বিমান বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালাইয়া প্রায় সমগ্র ইউরোপ পদানত করিয়া ফেলিল। ফ্রান্স সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া জার্মানীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সময় আফ্রিকায়ও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং শত্রুর আক্রমণে ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে সাগরপথে জার্মান সাবমেরিণের আক্রমণে মিত্রপক্ষের বহু জাহাজ বিনষ্ট হয় এবং বহির্জগতের সহিত ইউরোপের যোগাযোগ পথ ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। ১৯৪১ সালের মধ্যভাগে জার্মানবাহিনী মিত্রতা চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিল এবং দ্রুতগতিতে মস্কোর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। স্টালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত শত্রুকে বাধা দিতে লাগিল। এই বৎসরের শেষ ভাগে জাপান জার্মানপক্ষে যোগ দিল এবং অতর্কিত আক্রমণ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু যুদ্ধের জাহাজ ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তখন আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। জাপানী বাহিনী তড়িৎ গতিতে অগ্রসর হইয়া ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ একে একে জয় করিয়া মণিপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অনেক দ্বীপের উপর জাপানের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। মহাযুদ্ধ সুরু হইবার
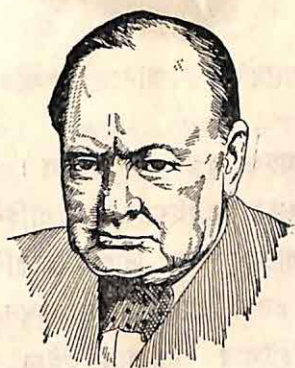
ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী
উইনস্টন চার্চিল

পূর্বেই জাপানের সহিত চীনের যুদ্ধ চলিতেছিল। বার বার পরাজিত হইয়াও চীনারা অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করিল। ১৯৪২ সালের শেষভাগে আমেরিকার একটি বিরাট বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় জার্মান ও ইটালীয়ান বাহিনীকে পরাজিত করিল। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের গতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। রাশিয়ার প্রতি-আক্রমণের ফলে বিরাট জার্মান বাহিনী পিছনে হটিতে হটিতে পোল্যাণ্ডের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মিত্রবাহিনী ইটালীতে অবতরণ করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বে ইটালীকে সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য করিল। সঙ্গে সঙ্গে মুসোলিনির পতন হইল। কিছু কাল পরে মুসোলিনি ক্ষিপ্ত জনতার হাতে নিহত হইলেন। ১৯৪৪ সালে মিত্রবাহিনী ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু করিল। রাশিয়া ও ফ্রান্স, এই উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া জার্মান বাহিনী আর সামলাইতে পারিল না। ১৯৪৫ সালের মধ্য ভাগে চারিদিক হইতে মিত্রবাহিনী যখন জার্মানীর ভিতরে প্রবেশ করিল তখন জার্মানী বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করিল। হিটলার নিরুপায় হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। ইউরোপে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। জাপান আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালাইয়া গেল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে ভয়াবহ এ্যাটম বোমা মারিয়া যখন আমেরিকা এক নিমেষে হাজার হাজার অধিবাসী সহ হিরোসিমা ও নাগাসাকি নগর দুইটি একেবারে ধ্বংস করিল তখন

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

জাপানও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষ হইল।

**শান্তির সমস্যা।** যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল কিন্তু পৃথিবীতে শান্ত আসিল না। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতভেদ ও দলাদলির জন্য এখনও স্থায়ী শান্তি স্থাপনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি পরস্পর বিরোধী দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে রহিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলি ; আর অপর দিকে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের নেতৃত্বাধীনে সংঘবদ্ধ হইয়াছে পশ্চিম ইউরোপ ও ইঙ্গ-আমেরিকার প্রভাবাধীন বিশ্বের অন্যান্য বহুরাষ্ট্র। ইহারা মনে করে কমিউনিস্ট আদর্শ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে গণতন্ত্র ও মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। এই দুইটি শক্তিচক্রের বিরোধ বিশ্বের শান্তি ব্যাহত করিতেছে। ভারতবর্ষ ইহার কোন দলে যোগ না দিয়া নিরপেক্ষ থাকিয়া সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

**সম্মিলিত জাতিসংঘ।** যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন ভবিষ্যতে বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্য বিশ্বজাতিসংঘের অনুরূপ আর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরা আমেরিকায় একটি সম্মেলনে মিলিত হন। এখানে 'সম্মিলিত জাতিসংঘ' ( U.N.O. বা য়ুনো ) গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৫ সাল হইতে ইহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে বিশ্বের ৬০টি রাষ্ট্র য়ুনোতে যোগ দিয়াছে। যুদ্ধ বন্ধ করিয়া বিশ্বের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা য়ুনোর প্রধান উদ্দেশ্য। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত মানুষের কতকগুলি অধিকার স্বীকার করিয়া একটি মানবিক অধিকার-পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। এই

সকল অধিকার মানুষ যাহাতে নির্বিবাদে ভোগ করিতে পারে, সেই দায়িত্ব য়ুনোর উপর ন্যস্ত আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য বহুবিধ উন্নতি যাহাতে হয় সে দায়িত্বও য়ুনো গ্রহণ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি সমিতিও গঠন করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতির উন্নতি-কল্পে গঠিত হইয়াছে যে সমিতি তাহাকে য়ুনেস্কো (UNESCO) বলা হয়।
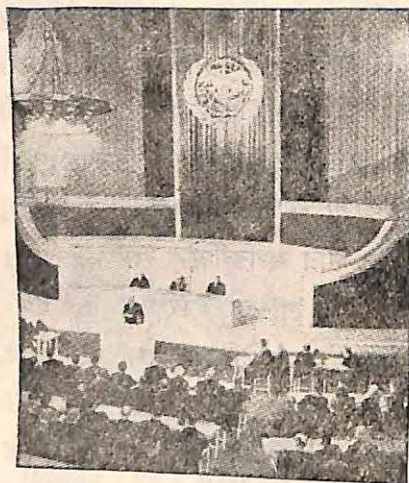
ইউ. এন. ও. সাধারণ অধিবেশন

বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির ভার আছে WHO বা বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার হাতে।

য়ুনো গঠিত হইবার পর ইহা জাতিতে জাতিতে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়াছে এবং বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। অনগ্রসর দেশগুলির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করিতেছে। ভারতবর্ষ য়ুনোর একজন প্রভাবশালী সদস্য এবং বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে ভারতের নিরলস প্রচেষ্টা সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

## কালপঞ্জী

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ ফার্দিনান্দ নিহত—১৯১৪ (২৮শে জুন)

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ—১৯১৪ (৪ঠা আগস্ট)—১৯১৮ (নবেম্বর)

যুদ্ধ বিরতি—১৯১৮ ( ১১ই নবেম্বর )

ভার্সাই সন্ধি—১৯১৯

বিশ্ব-জাতি-সংঘের প্রথম অধিবেশন—১৯২০

মুসোলিনি কর্তৃক ইটালীর শাসনভার গ্রহণ—১৯২২

হিটলারের শাসন ভার গ্রহণ—১৯৩৩

জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে মৈত্রী চুক্তি—১৯৩৬

জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল—১৯৩৮

জার্মানী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার—১৯৩৯

জার্মান সৈন্যের পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ আরম্ভ —১৯৩৯ ( ১লা সেপ্টেম্বর )

জাপান-জার্মানী-ইটালী মৈত্রী চুক্তি—১৯৪০ ( ২৭শে সেপ্টেম্বর )

জার্মানীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণ—১৯৪৫ ( ৭ই মে )

জাপানের উপর প্রথম অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ—১৯৪৫ ( ৫ই আগস্ট )

জাপানের আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ শেষ—১৯৪৫ ( ১৪ই আগস্ট )

সম্মিলিত জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন—১৯৪৬ ( ১০ই জানুয়ারী )

---

## এশিয়ার জাগরণ ও পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভ

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতিগুলি নূতন করিয়া সমগ্র বিশ্বে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের এক বিস্তীর্ণ অংশের উপর উহাদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তৃত হইল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির শোষণনীতির ফলে এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে জাতীয় জাগরণ দেখা দিল এবং তাহারা পুনরায় স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। যে সকল জাতি বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হইবার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিল তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ ছিল অগ্রণী।

### (ক) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

**সূচনা।** ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন গ্রামীন সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সমাজ ও ধর্মে আসিয়াছিল দুর্নীতি, কুসংস্কার ও পঙ্কিলতা। ইহার ফলে জাতীয় জীবনে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য কয়েকজন বাঙ্গালী মনীষীদের চেষ্টার ফলে এদেশে পাশ্চাত্য

রামমোহন

শিক্ষার প্রবর্তন হইল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ধর্ম, সমাজ ও চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় জীবন হইতে অন্ধ কুসংস্কার ও দুর্নীতি দূর করিয়া নূতন করিয়া সমাজ ও জাতিকে গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইল। বাংলার ব্রাহ্মসমাজ, উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবের আর্যসমাজ এবং মহারাষ্ট্রের প্রার্থনাসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে জাতীয় জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে বহু সংস্কার সাধিত হইল এবং ইহার ফলে এক নবীন ভারত জন্মগ্রহণ করিল। এই সকল পরিবর্তনের ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে দেশের শাসন-কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে লইয়া প্রগতিশীল ইউরোপীয় জাতিগুলির সমকক্ষ হইয়া উঠিবার আকাঙ্খা জাগিল। কিন্তু ইহাতে বৃটিশ শাসকবর্গের নিকট হইতে বাধা আসিল। ভারতের জনসাধারণের মনে তখনও জাতীয়তা বোধ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই। তাহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। জন-সাধারণের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগাইয়া এবং তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া দেশের শাসনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে জাতীয় নেতারা কাজ আরম্ভ করিলেন। বাংলা দেশেই প্রথম জাতীয় আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিল। এ কাজে অগ্রণী হইলেন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ। ক্রমে এই আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল।

সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীঅরবিন্দ

তিলক

লাজপৎ রায়

বিপিনচন্দ্র পাল

**কংগ্রেস স্থাপন।—স্বাধীনতার পথে ভারত।** ১৮৮৫ সাল ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক এবং কয়েকজন খ্যাতনামা ভারতীয় নেতার উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস স্থাপিত হইল। বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সভাপতি ছিলেন। প্রতিবৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহার অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম প্রথম কংগ্রেসে ভারতবাসীর অভাবঅভিযোগের কথা আলোচনা করা হইত। তারপর কংগ্রেস সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া দেশবাসীর জন্য নূতন নূতন অধিকার দাবি করিতে লাগিল। কংগ্রেসের শক্তি ও জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট ভীত হইল এবং ইহার বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম যুগে জাতীয় কংগ্রেসের বড় বড় নেতা ছিলেন দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ, বদরুদ্দিন, তায়েবজি এবং ফিরোজশাহ্ মেটা।

**বিপ্লবী দলের প্রভাব।** এতদিন কংগ্রেস নিয়মতন্ত্রের পথে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আবেদননিবেদনের মধ্য দিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভের চেষ্টা করিতেছিল। ইংরাজ সরকার যখন কিছুতেই ভারতবাসীর দাবি মানিয়া লইল না, তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেসের মধ্যে একটি দল জোর করিয়া বৃটিশ শাসনের অবসান করিবার জন্য বিপ্লব ও রক্তপাতের পথে পা বাড়াইল। বাংলার শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এই বিপ্লবীদলের পুরোভাগে দাঁড়াইলেন। দেশের স্থানে স্থানে ইটালী ও রাশিয়ার ন্যায় গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইল, গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন চলিল। গভর্ণমেণ্ট

অতি কঠোরতার সহিত এই আন্দোলন দমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। বাংলা ও মহারাষ্ট্র হইল এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। রাজপুরুষগণ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

**বঙ্গ-ভঙ্গ—স্বদেশী আন্দোলন।** দেশের অবস্থা যখন এরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিল তখন লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি দেখিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব করিতেছে প্রধানতঃ বাঙ্গালীরা ; আবার বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্রও বাংলা দেশ। সুতরাং কঠিন আঘাতে বাঙ্গালী জাতিকে হতবীর্য করিতে না পারিলে কংগ্রেসের শক্তি কমিবে না এবং বিপ্লব আন্দোলনও শান্ত হইবে না। এজন্য তিনি ১৯০৫ সালে, শাসন কার্যের সুবিধা হইবে এই অজুহাতে বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা, এই দুইটি প্রদেশ গঠন করিলেন। তখন আসাম পূর্ব বাংলার এবং বিহার ও উড়িষ্যা পশ্চিম বাংলার অংশ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র

কার্জনের এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতি রুখিয়া দাঁড়াইল। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল। বহু মুসলমান এই আন্দোলনে যোগ দিল। শুধু বাংলা দেশে নয় সারা ভারতে এই বিভাগ রদ করিবার দাবি উঠিল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, রসুল প্রভৃতি জনপ্রিয় নেতার নেতৃত্বে বাঙ্গালী 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইল এবং বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধন'

উৎসবের সূচনা করিয়া জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, ভাই ভাইতে কোন বিভেদ বাঙ্গালী মানিবে না। দেশবাসী সেদিন বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে বিলাতী পণ্য বর্জনের শপথ লইল এবং স্বদেশী শিল্প বাঁচাইয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করিল। ইহা স্বদেশী আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ

**সরকারী দমননীতি—বঙ্গ-ভঙ্গ রদ।** ইংরাজ সরকার স্বদেশী আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য অতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। নেতারা অনেকেই নির্বাসিত অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। সরকারী দমন নীতির বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুবকরা সংঘবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহারা কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করিল। কয়েকজন বিপ্লবী ধরা পড়িল, অনেকের প্রাণদণ্ড হইল। ইহাদের মধ্যে মেদিনীপুরের ক্ষুদিরামের নাম অমর হইয়া আছে। গভর্ণমেণ্টের নির্মম অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া বালক ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকী একজন অত্যাচারী ইংরাজ রাজকর্মচারীকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিল। ধরা পড়িয়া প্রফুল্ল আত্মহত্যা করিল; ক্ষুদিরাম মজফরপুরে ফাঁসীর মঞ্চে হাসি মুখে প্রাণ দিল। তরুণ বালকদের দেশের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ সারা দেশে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। অপূর্ব উৎসাহের সঙ্গে একের পর আর তরুণের দল স্বাধীনতা লাভের জন্য মৃত্যু পণ করিয়া আগাইয়া আসিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রমাদ গণিল। কঠোর নীতির দ্বারা জাতীয় আন্দোলন দমন করা

যাইবে না বুঝিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্ট অবশেষে বাধ্য হইয়াই বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া জনসাধারণকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। দুই বাংলা আবার এক হইল, কিন্তু আসাম ও বিহারকে বাংলা হইতে পৃথক্ করা হইল (১৯১২)। জাতীয় আন্দোলন ইহাতেও প্রশমিত হইল না।

**প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ—মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব।** ইহার পর ১৯১৪ সালে আসিল প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারতবাসী অকাতরে ধনপ্রাণ দিয়া ইংরাজদের সাহায্য করিল। ইংরাজ সরকার ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষে যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল (১৯১৯) তাহাতে স্বায়ত্ত শাসনের যে সামান্য অধিকার আসিল উহাতে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইল না। তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইংরাজ সরকার বর্বর নিষ্ঠুরতার সহিত আন্দোলন দমনে প্রবৃত্ত হইল। নেতারা ও সাধারণ কর্মীরা দলে দলে কারাবরণ করিলেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হইল। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চলিল। প্রায় একহাজার নরনারী ও শিশুর রক্তে জালিয়ানওয়ালাবাগের উষর মাটি সিক্ত হইল। ভারতবাসী পরাধীনতার দুঃখ সেদিন ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিল।

**অসহযোগ আন্দোলন।** এই সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক অসাধারণ শক্তিশালী ও সর্বত্যাগী নেতার আবির্ভাব হইল। তাঁহার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সমস্ত বিশ্বে তিনি মহাত্মা গান্ধী নামে খ্যাত। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এক অভিনব উপায়ে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। তিনি বহুকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় অধিবাসীরা ভারতীয় এবং অন্যান্য

'কালা' মানুষদের মানুষ বলিয়াই মনে করিত না, তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। মানুষের এই অপমানে গান্ধীজী ব্যথিত হইলেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সত্যাগ্রহ কথাটির মূল অর্থ হইতেছে, যাহা অন্যায় তাহাকে সুনিশ্চিতভাবে প্রতিরোধ করিতে হইবে ; সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোন আপোষ করা চলিবে না। সত্য ও ন্যায়ের আদর্শকে জয়যুক্ত করিবার জন্য মানুষ যদি নির্ভীক হইয়া, অহিংস থাকিয়া সমস্ত দুঃখ, নিপীড়ন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে দৃঢ় সংকল্প হয় তবেই পশু শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে। আফ্রিকার নির্যাতিত মানুষ গান্ধীজীর বাণী গ্রহণ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সফল করিল। গান্ধীজী অহিংসার বাণী লইয়া ভারতে আসিলেন।

মহাত্মা গান্ধী

কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়া গান্ধীজী এবার সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ( ১৯২০ )। জনগণ সহযোগিতা না করিলে রাষ্ট্র শাসন চলে না। এজন্য তিনি দেশবাসীকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে বারণ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সুসংহত বৃটিশ রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, নিরস্ত্র জনতার হিংসার সংগ্রাম চলিবে না ; ইহাতে পরাজয় অনিবার্য। এজন্য তিনি অহিংস সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিলেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নিজের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ তাঁহার ডাকে সাড়া দিল। এই সময় গান্ধীজীর সহকর্মীরূপে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আজাদ, বল্লভভাই

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

পণ্ডিত নেহেরু

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্যাটেল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, জহরলাল প্রভৃতি আরও অনেক দেশবরেণ্য নেতা। এদিকে এই সময় তুরস্কের খলিফার প্রতি ইংরাজ ও মিত্র-শক্তিগুলির ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হইয়া মুসলমানরাও গান্ধীজীর সহিত যোগ দিল। মুসলমানদের এই আন্দোলন খিলাফত আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ। সরকার এই গণ-আন্দোলন দমন করিবার জন্য নেতাদের জেলে পাঠাইল; দেশের লোকের উপরে চলিতে লাগিল অসাধারণ নির্যাতন। প্রায় ৩০ হাজার সত্যাগ্রহী এই সময় কারারুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকজন আন্দোলনকারী যখন হিংসার পথ গ্রহণ করিল তখন গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। গভর্ণমেণ্ট গণবিক্ষোভের রূপ দেখিয়া বিস্মিত ও শঙ্কিত হইল।

**আইন-অমান্য আন্দোলন।** অসহযোগ আন্দোলনের আট বৎসর পরে কংগ্রেস লাহোরের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল। কিন্তু ইংরাজ সরকার কিছুতেই ভারতের দাবি মানিতে স্বীকৃত হইল না। আন্দোলনের গতিরোধ করিবার জন্য সরকার নূতন নূতন দমন আইন প্রণয়ন করিল। তখন গান্ধীজী 'আইন অমান্য আন্দোলন' আরম্ভ করিলেন। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সভা করিয়া জনসাধারণ স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প গ্রহণ করিল। গান্ধীজীর নির্দেশে জনসাধারণ সরকারের পুলিশবাহিনীর সম্মুখেই লবণ আইন ভাঙ্গিল। তারপর একে একে দমনমূলক আইনগুলিও ভাঙ্গিতে লাগিল। এবারেও সরকার অতি কঠোরভাবে আন্দোলন সমূলে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। সরকারের নির্মম অত্যাচার জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিতে পারিল না। অবশেষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নতি স্বীকার করিল। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের লইয়া বিলাতে এক গোল টেবিল বৈঠক

বসিল। কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজী উহাতে যোগ দিলেন। কিন্তু ইংরাজের কূটনীতির প্রভাবে সর্বদলসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। গান্ধীজী নিরাশ হইয়া ফিরিলেন।

**১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন।** ইহার পর বৃটিশ সরকার ভারতের জন্য এক নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিল। ইহাতে কংগ্রেসের দাবি পুরাপুরি মানা হইল না বটে, কিন্তু প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইল। অনেকগুলি প্রদেশে কংগ্রেসদল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসন পরিচালনা করিতে লাগিল। দেশে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চলিতে লাগিল।

**দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ—স্বাধীনতা লাভ।** ১৯৩৯ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভারতের জনমত না লইয়াই ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাইল। কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে ইংরাজ সরকারকে জানাইয়া দিল যে, ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে ভারতবাসী যুদ্ধে ইংরাজকে কোন সাহায্য করিবে না। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় সর্বত্র কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিল। গান্ধীজী আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এদিকে যুদ্ধে ইংরাজরা সর্বত্র পরাজিত হইতে লাগিল। তখন বিপদ গণিয়া ইংরাজ সরকার কংগ্রেসের সহিত আপোষ রফার চেষ্টা করিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নূতন যে শাসন সংস্কার প্রস্তাব আসিল কংগ্রেস উহা অগ্রাহ্য করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই 'ইংরাজ ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস তীব্র আন্দোলন সুরু করিল। সারা ভারতে গণবিক্ষোভ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ইহা আরম্ভ হয়, এজন্য এই বিপ্লব 'আগস্ট বিপ্লব' নামে প্রসিদ্ধ। ইংরাজ সরকারও সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহা দমন করিবার চেষ্টা

করিল। অসংখ্য লোক কারাগারে গেল, কত স্থানে বিক্ষোভকারীরা ইংরাজের গুলিতে প্রাণ দিল ; তবুও এ আগুন একেবারে নিভিল না। এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র সরকারী পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া পলায়ন করিয়া জার্মানীতে গেলেন। সেখানে ভারতীয়দের লইয়া তিনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ইতিমধ্যে জাপানী সৈন্য ইংরাজদের পরাজিত করিয়া ভারতের পূর্ব সীমান্তে প্রবেশ করিল। নেতাজী পূর্ব ভারতে আসিয়া একটি শক্তিশালী আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। জাপানীরা তাঁহাকে সাহায্য দিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে ভারতীয় নরনারী নেতাজীর স্বাধীন ভারতের পতাকাতলে সমবেত হইয়া দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে আগাইয়া আসিল। নেতাজী দেশবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন— "তোমরা আমাকে রক্ত দেও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।" সৈন্যবাহিনীকে হাঁক দিয়া বলিলেন, "চল, দিল্লী চল।" সমস্ত জাতির মধ্যে অপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দিল।

মহম্মদ আলি জিন্না

গান্ধীজী ও নেতাজী দেশে যে আগুন জ্বালিলেন তাহা আর নিভিল না। ইংরাজ সরকার বুঝিতে পারিল এদেশে আর রাজত্ব করা চলিবে না। তাহারা তখন ভারতবাসীর সহিত আপোষ করিবার জন্য মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে ভারতে পাঠাইল। কথাবার্তা আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক

রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবি করিল। সমস্ত দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইল। তখন অনেক আলাপআলোচনার পর ভারতবর্ষকে ভাগ করিয়া ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান—এই দুইটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হইল; পরে ইহা পার্লামেণ্ট নামে অভিহিত হইল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইল। শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ হইলে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। স্বাধীন ভারত এখন বৃটিশজাতি সংঘের একজন বিশিষ্ট সদস্য। বর্তমানে দেশবরেণ্য নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

## (খ) মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংরাজ সরকারের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল তখন পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি দেশে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। মিশর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং আরব দেশ ও পারস্য লইয়া যে বিরাট অঞ্চল আছে তাহা মধ্যপ্রাচ্য নামে খ্যাত। এখানকার মুসলমান অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দেলন আরম্ভ করিয়া অনেক পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

**মিশর।** উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিশরের উপর ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মিশরীরা বিদেশীর আধিপত্য পছন্দ করিত না। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় প্রত্যেক জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিবার

অধিকার স্বীকৃত হয়। মিশরীদের মনে ইহা নূতন আশার সঞ্চার করে। কিন্তু ভাসাই শান্তি বৈঠকে মিশরীদের স্বাধীনতা লাভের দাবী উত্থাপন করিতে দেওয়া হইল না। ইহাতে জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরীরা একটি দল গঠন করিয়া তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিল। বৃটিশ সরকার এখানেও নির্মম অত্যাচার করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করিল। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অদম্য চেষ্টা করিয়াও যখন ইংরাজরা আন্দোলন দমন করিতে পারিল না তখন তাহারা মিশরকে স্বাধীন দেশ বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু মিশরে কয়েকটি বিষয়ের উপর তাহারা কর্তৃত্ব রাখিল। ইহার ফলে পূর্ণ স্বাধীনতা মিশরে আসিল না। ইহাতে মিশরবাসীরা অসন্তুষ্ট হইল। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া মিশরের সহিত বৃটিশ সরকারের বিবাদ ঘনীভূত হইল। সম্প্রতি মিশরের সহিত ইংরাজ সরকারের একটি মীমাংসা হইয়াছে। ইহার ফলে মিশর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

**মধ্যপ্রাচ্যের আরব অধ্যুষিত দেশ সমূহ**। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্বে সিরিয়া ও আরব অঞ্চলের দেশগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। কিন্তু তুর্কীদের সহিত আরবদের সদ্ভাব ছিল না। তাহারা তুর্কীদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ কালে ইংরাজদের প্ররোচনায় আরব দেশগুলি তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। ইংরাজরা তখন আশা দিয়াছিল যে, যুদ্ধের শেষে সমস্ত বিক্ষিপ্ত আরব জাতিগুলিকে মিলাইয়া একটি বড় স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হইবে। কিন্তু যুদ্ধের শেষে আরবদের আশা পূর্ণ হইল না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কূট চাল চালিয়া আরব অঞ্চলকে কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত করিয়া পরোক্ষভাবে উহাদের অভিভাবক হইয়া বসিল। এই সকল রাজ্যের

মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ এবং ফরাসীরা নিজেদের স্বার্থে ইহাদের শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। আরবদেশে একমাত্র নেজ্‌দ্‌ ও ইয়েমেন স্বাধীন রহিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই ব্যবহারে আরবজাতি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং বিদেশী আধিপত্য লোপ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। আরব অঞ্চল এখনও সম্পূর্ণভাবে বিদেশী প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই।

**ইরাণ**। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইরাণের ( পারস্য ) স্বাধীনতাও বিদেশীদের চক্রান্তে বিপন্ন হইয়া পড়িল। ইরাণে ভাল ভাল তেলের খনি আছে। এজন্য বিদেশীদের দৃষ্টি ইরাণের উপর পড়িল। উত্তর হইতে রাশিয়া এবং দক্ষিণ হইতে ইংলণ্ড ক্রমাগত চাপ দিয়া যথাক্রমে ইরাণের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল। ইরাণ নামে স্বাধীন হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি দেশের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল। এই সময় ইংরাজরা ইরাণের শাহকে বাৎসরিক সামান্য অর্থ দিবার বিনিময়ে ইরাণের তেলের খনির কর্তৃত্ব লইল।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পরে রাশিয়া ইরাণের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিল। এই সুযোগে ইংরাজ সৈন্য ইরাণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলিল। দুর্বল শাহ ইংরাজ কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া এক সন্ধি করিলেন। এই সময় ইরাণের সৌভাগ্যক্রমে রেজা খাঁ পহ্লবী নামে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী নেতার আবির্ভাব হইল। তিনি দেখিলেন, দেশ বিদেশী শত্রুর হাতে চলিয়া যাইতেছে। আসন্ন পরাধীনতা হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেশকে বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং সফলতাও অর্জন করিলেন। জনসাধারণ তাঁহাকে দেশের রাজা নির্বাচিত করিল। রেজা খাঁর শাসনে ইরাণ

অনেক উন্ন[illegible]াছে। এখন তাঁহার পুত্র রাজা হইয়াছেন। কিন্তু বিদেশীদের চক্রান্তে ইরাণে এখনও গোলমাল চলিতেছে।

**তুরস্ক।** প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তুরস্কের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল। সন্ধির সর্ত অনুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্য টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলা হইল। তুরস্ক সাম্রাজ্য বলিতে তখন রহিল মাত্র কনষ্টান্টিনোপল শহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী সামান্য ভূখণ্ড এবং এশিয়া মাইনরের পাহাড়-পর্বতময় আনাতোলিয়া অঞ্চল। আবার দেশ ভাঙ্গিয়া কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গঠন করা হইল; এশিয়া মাইনরের শস্যশ্যামলা উর্বরা অঞ্চল গ্রীস ও ইটালীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। আবার কনষ্টান্টিনোপল শহরের উপরও মিত্রপক্ষের কর্তৃত্ব স্থাপন করা হইল। সুলতান মিত্রপক্ষের খেলার পুতুল হইয়া পড়িলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধি রচনা করিয়া তুরস্কের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী তুর্কীরা এ অপমান স্বীকার করিয়া লইতে রাজী হইল না। মুস্তাফা কামাল নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী নেতার অধীনে তাহারা স্বাধীন নব্য তুরস্ক গড়িয়া তুলিবার সংকল্প গ্রহণ করিল। কামাল ছিলেন তুরস্কের একজন সৈন্যাধক্ষ্য। বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রাজনীতিক হিসাবেও তিনি ছিলেন অতি সুচতুর।

কামাল দেখিলেন, কনষ্টান্টিনোপলে থাকিয়া তুরস্ককে বাঁচাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুলতান জাতির স্বার্থ বিসর্জন দিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তিনি তাঁহার সহকর্মীদের লইয়া এশিয়া মাইনরের আনাতোলিয়া প্রদেশে একটি স্বাধীন তুরস্ক রাজ্য স্থাপন করিলেন। তুর্কী প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি জাতীয় পরিষদ কামালকে সভাপতি নির্বাচিত করিল।

ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্ররোচনায় গ্রীস একটি

শক্তিশালী বাহিনী কামালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। পথে তাহারা নির্বিচারে তুর্কীদের হত্যা করিতে করিতে চলিল এবং গ্রাম ও নগর আগুন লাগাইয়া শ্মশানে পরিণত করিতে লাগিল। এই অত্যাচারের ফলে তুর্কীরা ক্ষিপ্ত হইয়া দলে দলে কামালের পতাকাতলে সমবেত হইল। কামাল গ্রীকদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ইংরাজ ও ফরাসীরা বুঝিতে পারিল তুর্কী-জাতিকে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না। ১৯২৩ সালে লুসান শহরে এক নূতন সন্ধি হইল; ইহাতে কামালের প্রতিষ্ঠিত তুরস্কের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। তুর্কীরা ইউরোপ ও এশিয়া মাইনরে তাহাদের হৃত রাজ্যের এক অংশ ফিরিয়া পাইল। ইহার পর কামালের নেতৃত্বে জাতীয় পরিষদ সুলতানকে পদচ্যুত করিয়া তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিল। আনাতোলিয়ার আঙ্গোরা শহর হইল নব্য তুরস্কের রাজধানী। মুস্তাফা কামাল তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া তুর্কী জাতির পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। তুরস্ক আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

মুস্তাফা কামাল

## (গ) পূর্ব এশিয়া

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে বৃটিশ, ইন্দোচীনে ফরাসী এবং ইন্দোনেশিয়ায় ( জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি অঞ্চলে ) ওলন্দাজ অধিকার স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় এই

সকল দেশের অধিবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় এবং সর্বত্রই জাতীয়তাবাদী দল আন্দোলন চালাইতে থাকে। কিন্তু এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় হইতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়া গেল।

**স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা।** দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন এই সকল অধিকার করিয়া লইয়াছিল তখন তাহারা প্রত্যেক দেশেই জাপানের প্রভুত্বাধীনে দেশীয় লোকের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়াছিল এবং যুদ্ধের শেষে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানীরা যখন ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন তাহারা দেশের স্বাধীনতাকামী অধিবাসীদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও ও রসদ দিয়াছিল। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র পাইয়া ইহারা খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিল, এবং বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

**ইন্দোনেশিয়া।** যুদ্ধান্তে যখন ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃত্ব ওলন্দাজরা পুনরায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল তখন তাহাদের সহিত জাতীয়তাবাদী দলের বিরোধ বাধিল। উভয় পক্ষে কিছুকাল বিচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ চলিল। অবশেষে হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইল। ১৯৪৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সভাপতি হইয়াছেন ডাঃ সোকার্নো।

ডাঃ সোকার্নো
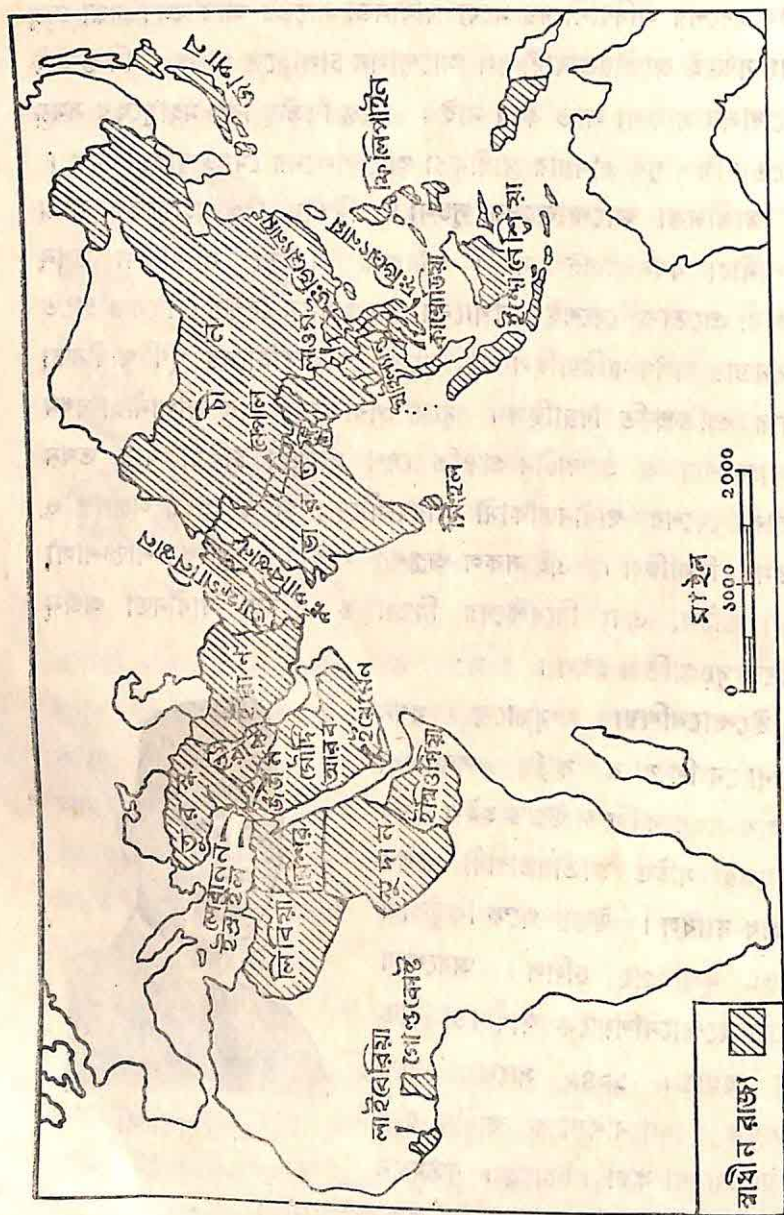
এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্য

**ইন্দোচীন।** ইন্দোচীনেও ফরাসী আধিপত্য বিলুপ্ত করিবার জন্য ডাঃ হো চি-মিনের নেতৃত্বে জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হইয়াছে। ইহারা জাপানী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫০ সালে ফ্রান্সে নরমপন্থী দলের সাহায্যে ইন্দোচীনে একটি ফরাসী তাঁবেদার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহার নাম ভিয়েৎনাম রাজ্য। কিন্তু এ ব্যবস্থায় ইন্দোচীনে সত্যিকার স্বাধীনতা আসে নাই। এজন্য জনসাধারণ ফরাসীদের বিরুদ্ধে এখনও প্রবল সংগ্রাম চালাইতেছে এবং বহুপরিমাণে সাফল্যলাভ করিয়াছে। হো-চি-মিন যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া ইন্দোচীনের উত্তরাংশে এক বিরাট অঞ্চল অধিকার করিয়াছেন। ইহা উত্তর ভিয়েৎনাম বা ভিয়েৎমিন রাষ্ট্র নামে খ্যাত। ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নামে পরিচিত। সম্প্রতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইন্দোচীন সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের মহান নেতা জহরলাল নেহেরু এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন।

ডাঃ হো-চি-মিন

**ব্রহ্মদেশ ও সিংহল।** ইংরাজরা যখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেল তখন ব্রহ্মদেশ ও সিংহল স্বাধীনতা লাভ করিল। সিংহল এখন বৃটিশ জাতিসংঘের ডোমিনিয়ন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হইয়াছে। মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য এখনও টিঁকিয়া আছে। সেখানে জনসাধারণের একটি বড় অংশ ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে।

**চীন।** ১৯২৫ সালে ডাঃ সান্-ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং-কাই-শেক কুয়ো-মিং-টাং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া চীনের সর্বাধিনায়ক হইলেন। ইহার পর তিনি সমস্ত চীন ঐক্যবদ্ধ করিবার

এশিয়া ও আফ্রিকার
পরাধীন রাজ্য
টিউনিসিয়া
সাইপ্রাস
কুওয়াইত
রিও ডিওরো
মরক্কো
আলজিরিয়া
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা
গাম্বিয়া
পর্তু. গিনি
সিয়েরা লিওন
নাইজিরিয়া
ফরাসী নিরক্ষীয় আফ্রিকা
এডেন
জিবুতি
সোমালিল্যাণ্ড
উগাণ্ডা
কেনিয়া
বেলজিয়ান কঙ্গো
ট্যাঙ্গানিকা
নিয়্যাসাল্যাণ্ড
মোজাম্বিক
মাদাগাস্কার
আঙ্গোলা
বেচুয়ানাল্যাণ্ড
দঃ রোডেসিয়া
সোয়াজিল্যাণ্ড
বাসুতোল্যাণ্ড
দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা
মালয়
সারাওয়াক
উঃ বোর্নিও
ডাচ নিউগিনি
মাইল
০
১০০০
২০০০
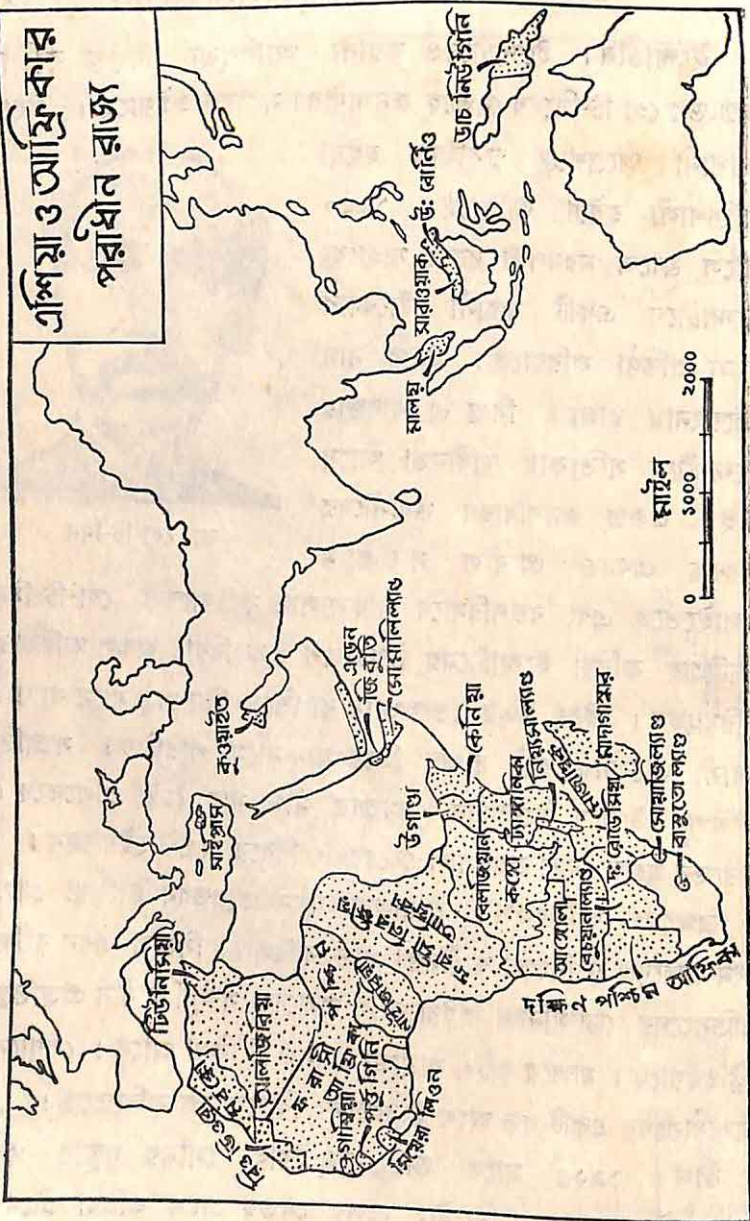
জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ধনিক ও ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেশের কৃষক ও মজুর শ্রেণীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিল। কমিউনিস্টদল চিয়াং-এর বিরোধিতা করিলে তিনি ইহাদের উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহার ফলে চীনে আবার গৃহযুদ্ধ বাধিল। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া জাপান চীন দখল করিয়া লইতে অগ্রসর হইল। তখন বিদেশী শত্রুর কবল হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কমিউনিস্টরা চিয়াং-এর সহিত হাত মিলাইয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে চীন মিত্রপক্ষের সহিত যোগ দিল এবং সকলে একাতাবদ্ধ হইয়া জাপানের তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। এই সময় চীনারা স্বদেশের কল্যাণের জন্য যেরূপ নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

১৯৪৫ সালে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের অবসান ঘটিল। তখন আবার চিয়াং-এর দলের সহিত কমিউনিস্টদের বিবাদ বাধিল। চিয়াং কমিউনিস্টদের দমন করিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার দুর্নীতিপূর্ণ শাসন সমর্থন না করায় চিয়াং-এর পরাজয় ঘটিল। কমিউনিস্টরা তাহাদের সুযোগ্য নেতা মাও-সে-তুং-এর পরিচালনাধীনে একের পর আর চীনের প্রদেশগুলি দখল করিয়া

মাও-সে-তুং

লইল। নিরাশ হইয়া চিয়াং ফরমোসায় পলায়ন করিলেন। সেখানে তিনি আমেরিকার সহায়তায় একটি আলাদা গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়া সমগ্র চীনের উপর কর্তৃত্ব দাবি করিতেছেন এবং ইহার নাম দিয়াছেন চীনের জাতীয় সরকার।

মাও-সে-তুং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চীনের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর উপর অভিজাত শ্রেণী ও শাসক সম্প্রদায় যে অকথ্য অত্যাচার তখন চালাইত তাহাতে মাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ইহার প্রতিবিধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন এবং কয়েকটি ছোটখাট বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলেন। কালক্রমে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনের কমিউনিস্ট দল গঠন করিলেন এবং ক্রমে ইহার সর্বোচ্চ নেতার পদ লাভ করেন।

১৯৪৯ সালে কমিউনিস্টরা চীনে একটি স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিয়াছে। ইহা চীন-লোক সাধারণতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। মাও-সে-তুং ইহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। চীনের মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি আছেন; কিন্তু চীন সরকারে কমিউনিস্ট দলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নূতন চীন সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শ গ্রহণ করিলেও স্বকীয়তা বিসর্জন দেয় নাই। এজন্য নূতন চীনের রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা সোভিয়েট রাশিয়া হইতে কতকটা স্বতন্ত্র। নূতন গভর্ণমেণ্টের অধীনে চীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

## কালপঞ্জী

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা—১৮৮৫

বঙ্গ-বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন—১৯০৫

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ—১৯১৪—১৯১৮

জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ড—১৯১৮ ( ১৩ই এপ্রিল )

অসহযোগ আন্দোলন—১৯১৯

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি—১৯২৯

আইন অমান্য আন্দোলন—১৯৩০

২য় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ—১৯৩৯—৪৫

নেতাজীর ভারত ত্যাগ—১৯৪১

পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজগঠন—১৯৪২

ভারতের স্বাধীনতালাভ—১৯৪৭ ( ১৫ই আগস্ট )

স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ভারত ঘোষণা—১৯৫০ ( ২৬শে জানুয়ারী )

কামাল পাশার জন্ম—১৮৮২

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক নব্য তুরস্ককে স্বীকৃতি—১৯২৩

ইন্দোচীনের স্বাধীনতা লাভ—১৯৪৯

চীন-লোক-সাধারণতন্ত্র—১৯৪৯

মাও-সে-তুং– জন্ম ১৮৯৩

মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার—১৯২২

আরব রাষ্ট্র গঠন ( সেভার্ সন্ধি )—১৯২০

রেজা খাঁ পহ্লবীর সিংহাসন লাভ—১৯২৫

---

# প্রশ্নাবলী

## ( ১ )

১। রেনেসাঁস্ কথাটির অর্থ কি? ইহা কবে ইউরোপে সুরু হইয়াছে? ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ রেনেসাঁসের আরম্ভ বলিয়া ধরা যাইতে পারে কিনা বল?

২। মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

৩। 'গ্রীক জীবনাদর্শ' বলিতে কি বুঝিতে পারি? গ্রীক বিদ্যার আলোচনা মধ্যযুগে মানুষের জীবনকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছে?

৪। রেনেসাঁস্ আন্দোলন ইটালীতে সুরু হইবার কারণ কি? ইহা কিভাবে ইউরোপে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

৫। হিউম্যানিস্ট সাহিত্য বলিতে কি বুঝিতে পার? কয়েকজন খ্যাতনামা হিউম্যানিস্ট লেখকের নাম ও তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। রেনেসাঁস যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? দান্তে, পেত্রার্ক, ম্যাকিয়াভেলি, বোকাচিও, সেক্সপীয়র, বেকন, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফাএল্, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রেমব্র্যাণ্ট, ভ্যান ডাইক, কোপার্নিকাস্, গ্যালিলিও, রেনেসাঁস্ যুগের স্থাপত্য রীতি।

৮। রেনেসাঁস্ যুগের কয়েকজন চিত্রশিল্পীর এবং তাঁহাদের অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির নাম কর।

৯। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে রেনেসাঁস্ আন্দোলন কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

১০। রিফর্মেশন কথাটির অর্থ কি? রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিল কেন? ইহার ফলাফল বর্ণনা কর।

১১। মার্টিন লুথারের সহিত পোপের বিরোধের কারণ কি? ইহার ফলে ধর্মজগতে কি পরিবর্তন আসিয়াছিল?

১২। ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন খ্যাতনামা ধর্মসংস্কারকের নাম বল এবং তাঁহাদের সংস্কারের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইংলণ্ড রোমান চার্চ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল কেন?

১৩। ইউরোপের ন্যায় ধর্ম উপলক্ষ করিয়া বড় যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত ভারতে হইয়াছে কি?

(২)

১। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের বিবরণ লেখ। এযুগের নাবিকরা আবিষ্কার যাত্রায় বাহির হইলেন কেন?

২। কি কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যুগের ভৌগোলিক অভিযানকে সম্ভব করিয়াছে? ইউরোপের কোন কোন দেশ ভৌগোলিক আবিষ্কারে প্রধান অংশ লইয়াছে?

৩। মহাসাগরের পথ আবিষ্কারের পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিত কিরূপে?

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় ইতিহাস ও সভ্যতায় কিরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে?

৫। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? দিক্‌দর্শন যন্ত্র, প্রিন্স হেনরি, বার্থলোমিউ দিয়াজ, ভাস্কো-দা-গামা, কলম্বাস্, ম্যাগেল্লান, আমেরিগো, কার্টেজ, পিজারো, সিবাস্টিয়ান ক্যাবট্।

(৩)

১। ভারতের প্রথম মুঘল সম্রাট কে? তাঁহার মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্যের কি পরিণতি হইয়াছিল?

২। হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে বিরোধের ফল কি হইয়াছিল? শেরশাহ সুশাসক ছিলেন কি?

৩। আকবরকে মুঘল সাম্রজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? তাঁহার শাসনকালের বড় বড় ঘটনাগুলি বর্ণনা কর।

৪। 'আকবর মুঘল সম্রাটদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।' আকবরের চরিত্র, নীতি ও প্রধান প্রধান কার্য আলোচনা করিয়া ইহা যথার্থ কিনা বল।

৫। আকবরের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান ?

৬। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্জহান, ও ঔরংজীব কোন কোন রাজ্য জয় করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন ? মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি কাহার সময়ে হইয়াছিল ? আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরংজীব পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি মানচিত্র অঙ্কিত কর।

৭। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর। ঔরংজীব ইহার জন্য কতটা দায়ী ?

৮। আকবর ও ঔরংজীবের চরিত্র ও নীতির তুলনামূলক বিচার কর।

৯। মুঘল যুগে যে সকল বিদেশী পর্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে সম্রাটদের সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি ? তাঁহারা এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

১০। মুঘল যুগের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ। মুঘল শাসনপ্রণালী ও বর্তমান শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি ? সে যুগ এবং বর্তমান যুগের শাসন নীতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি ?

১১। মুঘল যুগের শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১২। মুঘল যুগে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল ? কি উপায়ে ইহা আমরা জানিতে পারি ?

১৩। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান ? নাদির শাহ, ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য রীতি, সার টমাস রো, দীন ইলাহি, আইন্-ই-আকবরী।

## ( ৪ )

১। টিউডর যুগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান ?

২। স্টুয়ার্ট যুগে রাজায় প্রজায় বিরোধের কারণগুলি নির্ণয় কর।

৩। ১ম জেমস ও প্রথম চার্লসের সহিত পার্লামেন্টের বিরোধের বিবরণ লেখ। ইহার ফল কি হইয়াছিল ?

৪। অলিভার ক্রমওয়েল সম্বন্ধে কি জান ? তাঁহার শাসনব্যবস্থা টিকিল না কেন ?

৫। মহাবিপ্লবের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৬। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? দৈবসত্ত্ব, দ্বিতীয় জেমস্, দীর্ঘ পার্লামেণ্ট, পিটিশন অব্ রাইট্স্, বিল অব্ রাইট্স্।

## (৫)

১। ঔরংজীবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল বর্ণনা কর।

২। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের যুগে ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপনের সূচনা কেমন করিয়া হইল? দাক্ষিণাত্যে অধিকার বিস্তার লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে বিবাদ দেখা দিয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

৩। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদের বিবাদের কারণ কি? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? বাংলাদেশে ইংরাজ আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। ভারতে ইংরাজ অধিকার বিস্তারের পথে সবচেয়ে বেশি বাধা কাহারা দিয়াছিল? ইংরাজদের জয়লাভের কারণ কি?

৫। হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইঁহাদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ ও ফলাফল উল্লেখ কর।

৬। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল? ইংরাজরা মারাঠাদের কিরূপে পরাজিত করিল তাহা বর্ণনা কর।

৭। রণজিৎ সিংহ সম্বন্ধে কি জান? তাঁহার মৃত্যুর পর শিখরাজ্যের পতন ঘটিল কেন?

৮। সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি উল্লেখ কর। ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

৯। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? ডুপ্লে, ক্লাইভ, ইংরাজ কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫), মীর জাফর, মীর কাসিম, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, পেশবা, নানা ফড়নবিশ, সামন্ত তান্ত্রিক সন্ধি, বাহাদুর শাহ্, নানা সাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

১০। প্রধান প্রধান ঘটনা উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে ভারতে ইংরাজ রাজ্য বিস্তারের একটি ধারাবাহিক বিবরণ লেখ।

( ৬ )

১। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় অবস্থিত ইংরাজ উপনিবেশগুলির অবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

২। ইংলণ্ডের সহিত উপনিবেশগুলির বিরোধের কারণ কি উল্লেখ কর।

৩। আমেরিকা কিরূপে স্বাধীনতা লাভ করিল তাহা বর্ণনা কর।

৪। ইঁহাদের সম্বন্ধে কি জান? গ্রেণভিল, স্ট্যাম্প আইন, নর্থ, বার্ক, কর্ণওয়ালিশ, জর্জ ওয়াশিংটন।

৫। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

( ৭ )

১। ফরাসী-বিপ্লবের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। বিপ্লবের পূর্বে ফরাসীদেশের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে তুলনা মূলক বিচার কর।

৪। ইংলণ্ডের বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সমর ফরাসীজাতির মন কিরূপে প্রভাবিত করিয়াছে?

৫। ১৬শ লুই স্টেট্স জেনারেল আহ্বান করিলেন কেন এবং ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? স্টেট্স জেনারেল কিরূপে জাতীয় পরিষদে রূপান্তরিত হইয়াছিল বর্ণনা কর।

৬। ফরাসী রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন কেন ও কিরূপে হইল?

৭। ফরাসী-বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর।

৮। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? রুশো, ভলতেয়ার, বাস্তিল, স্টেট্স জেনারেল, জ্যাকোবিন দল, টেনিস্ কোর্টে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ, মানব অধিকারের সনদ, রোবেস্পিয়ের, বিভীষিকার রাজত্ব, নেপোলিয়ন।

(৮)

১। শিল্প-বিপ্লব কথাটির অর্থ কি? ইহা ইংলণ্ডে প্রথম সুরু হইল কেন?

২। শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে উৎপাদন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল এবং ইহার ফলে কি কি পরিবর্তন দেশে দেখা দিল?

৩। শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজে কি পরিবর্তন আসিয়াছে এবং এই পরিবর্তন তোমার বিবেচনায় শুভ অথবা অশুভ হইয়াছে।

৪। কৃষি ও বয়ন শিল্পে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে? যে সকল বিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তন আনিয়াছেন তাঁহাদের নাম কর।

৫। বাষ্পশক্তির আবিষ্কার কে করিয়াছেন? বাষ্পশক্তি প্রয়োগের ফলে শিল্পে কি পরিবর্তন আসিয়াছে?

৬। শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর।

৭। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? জেথ্রোটাল্, টাউনসেণ্ড, বেক্ওয়েল, হারগ্রীভ্‌স্, আর্করাইট্, ম্যাকাডাম, জেম্‌স ওয়াট, স্টিফেনসন্।

(৯)

১। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপের যে দু'টি দেশ ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম উল্লেখ কর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহাদের অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। ইটালী ও জার্মানী ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা কোথা হইতে পাইল?

৩। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের জীবনী অবলম্বন করিয়া ইটালীর স্বাধীনতা লাভের কাহিনী বর্ণনা কর।

৪। বিসমার্ক সম্বন্ধে কি জান? জার্মানীর ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বিসমার্কের দান কতটা?

৫। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভুর ও বিসমার্কের মধ্যে কাহাকে তোমার বেশি ভাল লাগে এবং কেন?

৬। জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনে বিসমার্কের কূটনীতির কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়?

৭। ইটালী ও জার্মানীর স্বাধীনতা লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা আসিয়াছিল কোথা হইতে?

( ১০ )

১। ক্রীতদাস প্রথা কত প্রাচীন বলিতে পার কি? প্রাচীনকালে ইউরোপের কোন কোন দেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল? প্রভুরা ক্রীতদাসদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিত?

২। আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত হইবার কারণ কি?

৩। কিভাবে ক্রীতদাসদের আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় আনা হইত? আমেরিকায় দাসদের জীবন কি ভাবে কাটিত বর্ণনা কর।

৪। আমেরিকায় দাসপ্রথার নৃশংসতার বিরুদ্ধে কাহারা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল?

৫। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে বিরোধের কারণ কি? ইহার পরিণাম কি হইয়াছিল?

৬। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বর্ণনা কর।

৭। আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথা কবে এবং কেমন করিয়া লোপ পাইল?

৮। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? হ্যারিয়েট বীচার, টমকাকার কুটির, আব্রাহাম লিংকন, কু-ক্লাক্স-ক্লান।

( ১১ )

১। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের কারণ কি? এ বিষয়ে কোন কোন জাতি অগ্রণী ছিল?

২। আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন কাহারা? তাঁহাদের সম্বন্ধে কি জান লেখ।

৩। ইউরোপীয় জাতি সমূহের আফ্রিকা ভাগাভাগি করিয়া লইবার কাহিনী বর্ণনা কর। ইহাতে সবচেয়ে লাভবান হইয়াছিল কোন দেশ?

৪। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া কিরূপে এবং কোথায় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৫। ইউরোপীয় ও আমেরিকান জাতি যে যে দেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছে তাহাদের নাম উল্লেখ কর।

৬। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? শ্বেত-জাতির বোঝা, লিভিংস্টোন, স্ট্যানলী, লেসেপ্‌স, অন্ধকার মহাদেশ।

৭। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলাফল কি হইয়াছিল?

## ( ১২ )

১। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীন ও জাপানের অবস্থা কিরূপ ছিল? পাশ্চাত্য জাতির সহিত ইহাদের সংযোগ কেমন করিয়া আরম্ভ হইল?

২। ইংরাজের সহিত চীনের বিবাদের কারণ কি এবং ইহার ফল কি হইয়াছিল?

৩। আফিম যুদ্ধের ফলে চীনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? চীনের পরাজয়ের ফলে পাশ্চাত্য জাতিরা কি কি সুযোগ লাভ করিয়াছিল? চীনারা পাশ্চাত্য জাতির নিকট পরাজিত হইল কেন?

৪। চীনের জাগরণ সুরু হইল কেমন করিয়া?

৫। ১৮৯৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬। চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধের কারণ কি এবং ইহার ফলাফল বর্ণনা কর।

৭। চীনে মাঞ্চু রাজবংশের পতনের কারণ কি? কে বা কাহারা পতন ঘটাইয়াছিল। চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল কেমন করিয়া?

৮। ডাঃ সান্‌-ইয়াৎ-সেন চীনের শাসন নীতিতে কি কি মূলসূত্র গ্রহণ করেন?

৯। চিয়াং কাই-শেকের সহিত কমিউনিস্টদের বিরোধের কারণ কি? চিয়াং চীনে ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন নাই কেন?

১০। ইউরোপীয় জাতির আগমনের পূর্বে জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

১১। জাপানের দ্বার উন্মুক্ত করিল কে? জাপানীরা ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিল কেন এবং ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল?

১২। চীন ও জাপানের দ্বন্দ্ব আসিল কেন? চীনের প্রতি জাপানী নীতি তুমি সমর্থন কর কি?

১৩। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? লিন্, আফিম যুদ্ধ, কুয়া-মিং-টাং, সান্ ইয়াৎ-সেন, চিয়াং-কাই-শেক্, মিকাডো, শোগান, সামুরাই, হিরোসিমা।

১৪। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল কি হইয়াছিল?

## (১৩)

১। রুশ-বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি? ফরাসী-বিপ্লবের সহিত ইহার তুলনা করা যায় কি?

২। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কিরূপ ছিল বর্ণনা কর। ঐ শতাব্দীতে আমাদের দেশের অবস্থার সহিত ইহার তুলনা করা যায় কি?

৩। সাম্যবাদের উদ্ভব হইল কি প্রকারে? ইহার আদর্শ কি? কার্ল মার্ক্স সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

৪। রাশিয়ায় বিপ্লব আসিল কেন? ইহার ফলাফল বর্ণনা কর।

৫। লেনিন ও তাঁহার সহকর্মীরা কি ভাবে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬। রাশিয়ায় রাষ্ট্রে ও সমাজে সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট মতবাদ প্রসার লাভ করিল কেন? ইহার কারণ বলিতে পার কি? ইহাতে সাধারণ লোকের জীবনে কি পরিবর্তন আসিয়াছে?

৭। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের অবস্থার কি কি উন্নতি করিয়াছে তাহার বিবরণ দাও।

৮। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? কার্ল মার্ক্স, লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রট্স্কি, ৭ই নবেম্বর (১৯১৭), লালফৌজ, সোভিয়েট বলশেভিক, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

৯। সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

## ( ১৪ )

১। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের মূল কারণ কি? ইহাকে বিশ্ব মহাযুদ্ধ বলে কেন?

২। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষ হইলে কি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে ঘোষণা করা হইয়াছিল? সন্ধির সর্ত রচনা কালে ইহা পালিত হইয়াছিল কি না এ সম্বন্ধে তোমার মতামত বল।

৪। সন্ধির সর্তের মধ্যে কি ত্রুটি ছিল এবং ইহার ফল কি হইয়াছিল বর্ণনা কর।

৫। যুদ্ধের নৃশংসতা ও ক্ষয় ক্ষতি সম্বন্ধে কি জান?

৬। বিশ্বজাতিসংঘ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল কেন?

৭। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ ঘটিল কেন? কোন কোন প্রধান প্রধান রাষ্ট্র ইহাতে যোগ দিয়াছিল? ইহাকে যান্ত্রিক যুদ্ধ বলে কেন? যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে যাহা জান বল?

৭। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছে?

৯। সম্মিলিত জাতিসংঘ কি উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে? ইহার কার্য সম্বন্ধে যাহা জান বল।

১০। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? যুবরাজ ফার্দিনান্দ, ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯), মুসোলিনী, হিট্‌লার, নাৎসী, ফ্যাসিস্ট, য়ুনেস্কো, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, উড্রো-উইলসন, মুস্তাফা কামাল পাশা।

## ( ১৫ )

১। এশিয়ার জাগরণ কথাটির অর্থ কি?

২। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কি জান? কাহারা ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। কার্জন বঙ্গ-ভঙ্গ করিয়াছিলেন কেন? ইহার ফল কি হইয়াছিল?

৪। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কোন্ পথে চলিয়াছিল ?

৫। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান ?

৬। মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আনিতে চাহিয়াছিলেন ?

৭। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৮। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান ? রাজা রামমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, তিলক, লালা লাজপত রায়, ক্ষুদিরাম, জালিয়ানওয়ালাবাগ, খিলাফত-আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, আগস্ট বিপ্লব (১৯৪২), ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন-আইন, ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র, আজাদ হিন্দ ফৌজ, মিঃ জিন্না, পাকিস্তান, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জহরলাল নেহরু।

৯। মিশর ও ইরাণের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান ?

১০। নব্য তুরস্কের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১১। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের ফলে আরব জাতির অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? আরব রাষ্ট্রগুলির অবস্থা বর্তমানে কিরূপ হইয়াছে ?

১২। পূর্ব-এশিয়ার দেশ সমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে ?

১২। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান ? মুস্তাফ কামাল, রেজাখাঁ পহ্লবী, জগলুল পাশা, সোকার্নো, হো-চি-মিন্ ও মাও-সে-তুং।

---